KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-70000

Record No : KLMLGK 2097	Place of Publication : ৪৪ সর্বানন্দ ভট্টাচার্য রোড, কল-১৫
Collection : KLMLGK	Publisher : শীর্ষ চট্টোপাধ্যায়
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 C.m.
Vol. & Number : ৫২/৪ ৫২/৫ ৫২/৭ ৫২/৮	Year of Publication : শ্রাবণ সংখ্যা ॥ Sep 1991 আশ্বিন সংখ্যা ॥ Oct 1991 কার্তিক সংখ্যা ॥ Nov 1991 অগ্রহায়ণ সংখ্যা ॥ Dec 1991
	Condition : Brittle Good
Editor : অমরেন্দ্র ঘড়াই	Remarks :

C.D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৬ অকটোবর, ১৯৯১

বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড· সন্তোষ ভট্টাচার্য।

লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর ব্যাপক গবেষণাসমৃদ্ধ সন্দর্ভ "ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির"-এর প্রথম কিস্তি।

পরিগ্রহণ-পর্বে হিন্দুধর্মে যে সংহতি এবং সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় তারই তথ্যসমৃদ্ধ পরিচয় দিয়েছেন ড· অরুণা হালদার।

একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প "রেলযাত্রীর ডায়রি" এবং অনূদিত আর· কে· নারায়ণের গল্প "ঈশ্বর ও মুচি"।

সাহিত্যে মনোবিদ্যার প্রয়োগ নিয়ে ড· শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের রিভিউ।

সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস-নির্মিতির প্রক্রিয়া নিয়ে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা।

মেয়েদের বুদ্ধির কম-বেশি নিয়ে ফিজিওলজিস্ট ড· দেবব্রত ঘোষের সরস আলোচনা।

দান্তের এঙ্গেলস্কৃত মূল্যায়ন কতখানি বস্তুনিষ্ঠ? সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের দীর্ঘ অভিমত।

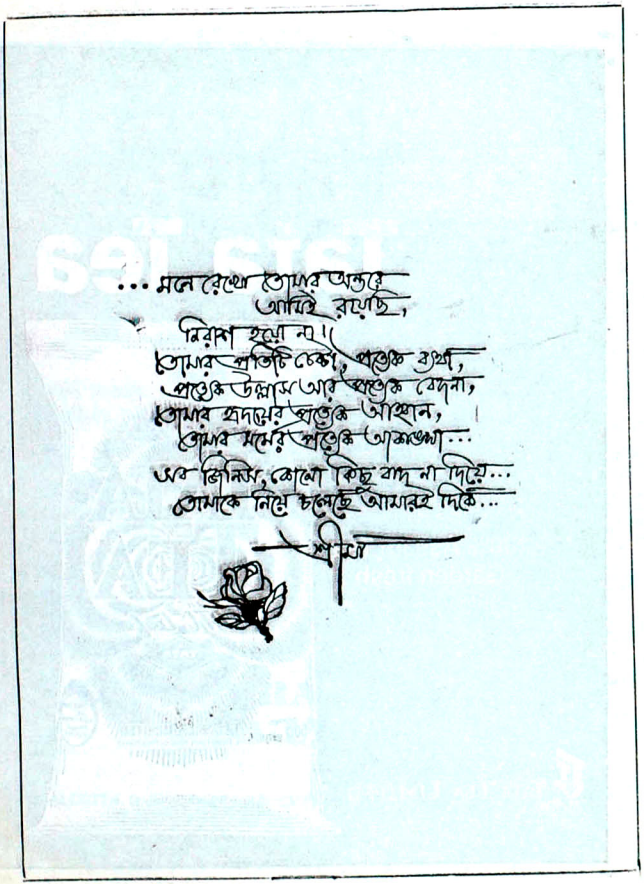

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৬
অকটোবর ১৯৯১
আশ্বিন ১৩৯৮

শিল্পপরিকল্পনা। বনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্বরদ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২১-৬৩২৭

বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতি : অসার তত্ত্ব

সন্তোষ ভট্টাচার্য

বৈদেশিক লেনদেনে ভারত যে অভূতপূর্ব সংকটে পড়েছে, তার নিরসনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এক বিকল্প আর্থিক নীতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী যেসব ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে সমস্যার আশু সমাধানের অর্থাৎ অচিরাৎ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা নেই। ভারতের অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং সে কথা প্রকাশ্যেই বলেছেন। তার কোনো প্রতিবাদ হয় নি ; কারণ, আশু সমাধানে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার -প্রস্তাবিত ব্যবস্থার, অর্থাৎ বিশ্ব অর্থ-ভাণ্ডারের ঋণের কোনো বিকল্প সত্যই নেই। একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প ঋণ-শোধে খেলাপ, যা কোনো দায়িত্বশীল মহলই প্রস্তাব করেন নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবে অবশ্য অনেক স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘ-মেয়াদি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। আশা করা হয়েছে যে, আয়করের হার-বৃদ্ধি, করসংগ্রহে প্রশাসনিক দৃঢ়তা, পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে অনগ্রাধিকার ব্যয়হ্রাস, কালোটাকার উদ্ধার, সরকারি প্রকল্পে দক্ষতাবৃদ্ধি, আমদানি-ছাঁটাই এবং অনাবাসী ভারতীয়দের নিকট লগ্নী করার আবেদন ইত্যাদি ব্যবস্থা স্বল্প মেয়াদে সঙ্কট নিরসনে সাহায্য করবে। অপ্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি, কনট্রোল দামের বৃদ্ধি, ভর্তুকি-হ্রাস ইত্যাদি প্রথাগত প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিকল্প স্বল্পমেয়াদি প্রস্তাবগুচ্ছের ভিত্তি হিসাবে কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয় —যার মূল নীতি হবে কৃষি ও শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণকল্পে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং রূপায়ণের প্রধান ব্যবস্থা হবে ভূমি-সংস্কার, শিল্পের মূলধনের মালিকানার বিকেন্দ্রীকরণ এবং অদূর ভবিষ্যতে শ্রমনিবিড় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। বিকল্প স্বল্পমেয়াদি প্রস্তাবগুচ্ছের অনেকগুলিই অ-বিতর্কিত। যেগুলি বিতর্কিত, তার সম্পর্কে অনেকেই মতামত দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং প্রস্তাব নিয়ে লেখার সংখ্যা বিরল। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার -প্রস্তাবিত বিকল্প দীর্ঘমেয়াদি নীতির আলোচনা।

দুই

দেশের আর্থিক উন্নতি বলতে বোঝায় দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি—তা কৃষিতেই

হোক, শিল্পেই হোক বা সেবা এবং বৃত্তিতেই হোক। চলিত বামপন্থী মতে, দেশের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় অভ্যন্তরীণ বাজারের অভাব; কারণ, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা নেই। একই যুক্তিতে, অপ্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি বা কনট্রোল দামের বৃদ্ধিতে আপত্তি করা হয়, কারণ তার ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে। অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত করার পক্ষে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল—স্বনির্ভরতা, অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর না করা। অভ্যন্তরীণ বাজার অর্থাৎ চাহিদার সম্প্রসারণ কিভাবে হয়?

বাজারের কাজ উৎপাদিত জিনিসপত্রের ক্রয়-বিক্রয় করানো। অতএব মনে হতে পারে, জনসাধারণের আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হলেই, জিনিসপত্রের চাহিদার বৃদ্ধি হবে এবং তার চাপে উৎপাদনেরও বৃদ্ধি হবে। এই সরল যুক্তি যদি যথার্থ হত, তাহলে নোট ছাপিয়ে জনসাধারণকে বেশি টাকা দিলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পেত। যুক্তিটি ভ্রান্ত, কারণ উৎপাদনবৃদ্ধির অন্যতম আবশ্যিক উপকরণ যে বাস্তব মূলধন, এবং ভোগের হ্রাসই যে বাস্তব মূলধন বৃদ্ধির একমাত্র উপায়—এই শাশ্বত সত্যকে যুক্তিটি চাপা দেয়। কোনো বিশেষ অবস্থায় বিদ্যমান মূলধনের সম্যক ব্যবহার না হলে, জনসাধারণের আর্থিক ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু মূলধন-অভাবী অনুন্নত দেশে তা সাধারণ সত্য নয়।

বাস্তব মূলধনের বৃদ্ধি এবং তার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগই অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের প্রধান, প্রায় একমাত্র, উপায়। উন্নত প্রযুক্তি এবং অধিক মূলধন (যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি) প্রয়োগ না করলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না, এবং সেই বর্ধিত উৎপাদন বাজারে ক্রয় করতে হলে পরিবর্তে শিল্পকেও বাজারে অধিক সামগ্রী আনতে হবে, যা উৎপাদন করতে শিল্পেও উন্নত প্রযুক্তি এবং আরও মূলধনের প্রয়োজন। অতএব, বাজারের সম্প্রসারণের মৌলিক শর্ত, বর্ধিত মূলধনী সামগ্রী এবং উৎকৃষ্ট প্রযুক্তি। যে-কোনো দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম যদি সেই শর্তের পূরণ সুনিশ্চিত না করতে পারে, অর্থনৈতিক তত্ত্বে তার কোনো সমর্থন নেই।

উৎপাদনে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করা এবং উৎকৃষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগ করা সুনিশ্চিত করার উপায় একটাই—তা হল ভোগকে হ্রাস করা বা সংযত করা। এ কথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, দেশের ক্ষেত্রেও তেমন সত্য। সারা দেশে যত মূলধনী দ্রব্য আছে, তা যদি কেবলমাত্র ভোগ্যসামগ্রীর উৎপাদন করে, তা হলে মূলধনের বৃদ্ধি হবে কী করে? অতএব, দেশের মূলধনের এক অংশ আরও মূলধন উৎপাদনের কাজে লাগাতে হয়। যেসব কর্মী এই মূলধন উৎপাদনের কাজ করেন, তাঁদেরও ভোগ্যদ্রব্য লাগে। সুতরাং, যাঁরা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন, তাঁরা নিজেরাই সবটা ভোগ করেন না।

এই প্রক্রিয়ারই অপর নাম—সঞ্চয় করা। সঞ্চয় করার অর্থ, সমপরিমাণ ভোগ্যদ্রব্যের অধিকার ত্যাগ করা, যা ব্যবহার করে কর্মীরা মূলধন উৎপাদন করে। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদকেরা নিজেরাই এটা করেন। একটা সরল দৃষ্টান্ত—উৎপাদিত খাদ্যশস্য থেকে বীজ সঞ্চয় করে রাখা। সম্পূর্ণ উৎপাদন ভোগ করলে, পরে আর উৎপাদন করা যাবে না। অন্যদিকে, বীজের যোগান বাড়ালে, উৎপাদনও বাড়বে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব উৎপাদকের নিজে এটা করার প্রয়োজন হয় না। কেউ-কেউ বা কোনো প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট বীজই উৎপাদন করে। তারপর, বাজার-মারফত বীজ এবং ভোগ্যশস্যের আদান-প্রদান হয়। তথাপি, বীজের উৎপাদন সামাজিক সঞ্চয়েরই ফল। অন্য উৎপাদকেরা যদি সঞ্চয় না করে তাঁদের সম্পূর্ণ উৎপাদনই ভোগ করতেন, বীজ-উৎপাদকেরা ভোগ্যশস্য পেতেন না, বীজের উৎপাদনও সম্ভব হত না। উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও, সঞ্চয়ের বৃদ্ধি একটা আবশ্যিক

শর্ত, কারণ প্রতিটি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যম নতুন ধরনের মূলধনী দ্রব্য। প্রয়োগ ত্বরান্বিত করতে হলে মূলধনের বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে পুরাতন-প্রযুক্তিনির্ভর মূলধনও বরবাদ করতে হবে। অর্থাৎ সঞ্চয় আরো বাড়াতে হবে।

বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা ধনতন্ত্রের বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা প্রণয়নে এই সরল সত্যকে স্বীকার করেছিলেন। সঞ্চয় বাড়ানো এবং সংগ্রহ করার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ছিল। কিন্তু তার প্রয়োজনের গুরুত্ব অস্বীকার করা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী তাত্ত্বিকেরা অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের কথা বলেন, অথচ বিস্ময়কর এই যে, তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি নীতিতে অভ্যন্তরীণ বাজার এবং ক্রয়ক্ষমতা সম্প্রসারণের যেটা মৌলিক ভিত্তি, সেই সঞ্চয়ের বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি নীতিতে কোনো বক্তব্য নেই।

তিন

বামপন্থী বিকল্পের দীর্ঘমেয়াদি নীতির রূপায়ণের প্রধান কার্যক্রম ভূমিসংস্কার, শিল্পে মূলধনের মালিকানার বিকেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমনিবিড় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। বাস্তবে অবশ্য, শেষোক্ত দুটি কার্যক্রম বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, বরং হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্ বাঁকুড়ায় পলিয়েস্টার কারখানা ইত্যাদি বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করে। যাই হোক, ভূমিসংস্কারের কার্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের দাবি—ভূমিসংস্কারই আর্থিক উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ এবং সে কাজে তাঁরা অনেকটাই সফল। সরল যুক্তিটা হল এই যে, ভূমিসংস্কার হলে কৃষির উৎপাদন বাড়বে, কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি হবে, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এবং শিল্পেরও প্রসার হবে, আরও অধিক কর্মসংস্থান হবে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদনে প্রভূত বৃদ্ধি ভূমিসংস্কারেরই সুফল।

ভূমিসংস্কারের ক্ল্যাসিকাল ধারণা—লাঙল যার, জমি তার। অর্থাৎ, যে চাষ করে তারই জমির মালিক হওয়া উচিত। চাষের কাজ ভালো করে করলে, বর্ধিত উৎপাদন যদি মধ্যস্বত্বভোগীরা নেয়, চাষির উৎসাহ থাকে না, উৎপাদন বাড়ে না। চাষি নিজে যদি ফসলের অধিকারী হয়, তার আয় বাড়াবার জন্য উৎসাহের সঙ্গে চাষ করবে, কৃষিরও উৎপাদন বাড়বে। এই ধারণা থেকে প্রায়শই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, চাষযোগ্য জমির মোটামুটি একটা সমবণ্টন হওয়া প্রয়োজন। কারণ জমির পরিমাণ অধিক হলে চাষির পক্ষে চাষ করা সম্ভব নয়। তাই, জমিদারিপ্রথা অর্থাৎ মধ্যস্বত্ব বিলোপের পরেও চাষযোগ্য জমির মালিকানার একটা উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, চাষি প্রয়োজনে শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে যতটুকু ভূমিসংস্কার হয়েছে, তা কিন্তু এই ক্ল্যাসিকাল ধারণা অনুযায়ী নয়। জমির মালিকানার পুনর্বণ্টনে চাষিরা সামান্যই উপকৃত হয়েছে, তবে ভাগচাষিদের অধিকার প্রায় ক্ষেত্রেই কায়েম করা হয়েছে। ভাগচাষিরা মালিক নয়,তারা ভাড়াটিয়া পর্যায়ের। তাদের উৎখাত করা যায় না, তবে মালিককে তারা বর্ধিত হারে ভাড়া দেয়, কারণ মালিক বর্ধিত উৎপাদনের একটা অংশ পায়। ভাগচাষিদের অধিকার কায়েম করাকে আংশিক ভূমিসংস্কার বলা চলে, কারণ ভাগচাষি বেশি উৎপাদন করলে, বর্ধিত উৎপাদনের অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না—এই ভরসায় সে চাষের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

ভূমিসংস্কার হলেই কি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়বে এবং শিল্পের প্রসার হবে? চাষি উৎসাহিত হয়ে চাষ করলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে—এই যুক্তি ভ্রান্ত। কারণ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আরও মূলধনের প্রয়োজন, অর্থাৎ পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি আবশ্যিক অঙ্গ। তর্কের খাতিরে যদি

স্বীকারও করা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে চাষির শ্রমই মূলধনী সামগ্রীর ঘাটতির পরিপূরক হবে এবং উৎপাদন বাড়বে, প্রশ্ন এই যে চাষি সেই বাড়তি উৎপাদন বিক্রয় করবে কি না, বাজারে আনবে কি না? চাষি যদি সেই বাড়তি উৎপাদনের সবটাই নিজেরই ভোগে লাগায়, শিল্পজ দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ার কোনো কারণ নেই। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, চাষি যদি বর্ধিত উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করে, উদ্বৃত্ত আয়ে সে কী করবে? যদি সে শুধুমাত্র শিল্পজ ভোগ্যদ্রব্য চায়, অর্থাৎ সঞ্চয় না করে, তাহলে কিন্তু শিল্পের প্রসার সম্ভব নয়, কারণ শিল্পের প্রসারের জন্যই হোক আর কৃষির প্রসারের জন্যই হোক, আরও বাস্তব মূলধনের প্রয়োজন, যা সঞ্চয় ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সাদা কথায়—শিল্পের বাজার বাড়াতে হলে বর্ধিত উৎপাদনের সমগ্রটাই ভোগ করলে চলবে না, একটা অংশ মূলধন উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে। বাড়তি উৎপাদনের আয় পুরো ভোগ না করে চাষিকে মূলধনী দ্রব্যও ক্রয় করতে হবে। সুতরাং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের মৌলিক শর্ত—সঞ্চয়ের বৃদ্ধি, ভূমিসংস্কার নয়।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষির উৎপাদন প্রভূত বৃদ্ধিলাভ করেছে বলে দাবি করা হয়। যদি সেই দাবি সঠিকও হয় অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের মৌলিক শর্ত পূরণ হচ্ছে কি? বর্ধিত উৎপাদন সঞ্চয়ের বৃদ্ধি করছে কি? পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যভিত্তিক সঞ্চয়ের, এমনকী স্বল্প-সঞ্চয়ের, বৃদ্ধির হিসাব সে সিদ্ধান্তে সাহায্য করবে না। কারণ, কে সঞ্চয় করছে, চাষিরা করছে কি না, তার হিসাব পাওয়া শক্ত। কৃষিজাত সঞ্চয় এবং আয়ের অনুপাত পাওয়া আরও শক্ত। তবে, সরকারি সংগ্রহমূল্যে সরকার কতটা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে সফল হচ্ছেন, তা কিছুটা ইঙ্গিত দেয়। এটা জানা কথা যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করতে পারেন না, অথচ সেই একই দামে, চাষিরা পানজাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এলাকায় প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য সরকারকে বিক্রয় করে। অর্থাৎ, চাল-গমের সংগ্রহ-মূল্য যদি ৫ টাকা কিলো হয়, আর পশ্চিমবঙ্গের খোলা বাজারের দর ১০ টাকা কিলো হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের চাষি ১০০ টাকা সঞ্চয় করার অর্থ সে ১০ কিলো চাল-গম বাজারে আনে, কিন্তু পানজাব এলাকার চাষি ১০০ টাকা সঞ্চয় করার অর্থ সে ২০ কিলো চাল-গম বাজারে আনে। স্পষ্টতই, পানজাব এবং সংলগ্ন এলাকার চাষির সঞ্চয়ের আগ্রহ এবং সামর্থ্য, পশ্চিমবঙ্গের চাষির আগ্রহ এবং সামর্থ্য অপেক্ষা অনেক বেশি। অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণে তাই পানজাব এলাকার কৃষির অবদান, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অপেক্ষা সমধিক। অথচ, পানজাব এবং সংলগ্ন এলাকায় বৃহৎ চাষিদেরই তো আধিপত্য, ভূমিসংস্কার হয় নি।

আসলে, উৎপাদন এবং বণ্টনের সম্পর্ক নিয়ে বামপন্থী বিকল্পে বিভ্রান্তি আছে। ভাগচাষে অধিকার জমির পুনর্বণ্টন এবং সিলিং, চাষে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে আয়ের কিছুটা সমতা আনে, গরিব ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ এবং শিল্পায়ন উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে, ভূমিসংস্কার তাকে ত্বরান্বিত করবে, এমন কোনো গ্যারানটি নেই। ভূমিসংস্কারের ফলে সঞ্চয় হ্রাস পেয়ে, ভোগ বেড়ে যেতে পারে, তখন অভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হবে, শিল্পায়ন রুদ্ধ হবে।

চার

ভূমিসংস্কার বিষয়ে যা আলোচনা করা হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তাবিত দ্বিতীয় দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম—শিল্পে মালিকানার বিকেন্দ্রীকরণ—সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। মালিকানার বিকেন্দ্রীকরণ হলে উৎপাদনে উৎসাহ বাড়তে পারে, পুরাতন মূলধনী যন্ত্রপাতিকে নিংড়ে উৎপাদন কিছুটা বাড়তেও পারে কিন্তু সেই বর্ধিত উৎপাদনের একটা অংশ সঞ্চিত হবে কি না, তার কোনো নিশ্চিতি নেই। অতএব, মূলধনের বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের বৃদ্ধিরও কোনো নিশ্চিতি নেই। সেই পথে যদি কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত করা যেত, তাহলে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে যৌথ খামার এবং শিল্পে সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার পথে যেতে হত না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মারফত সঞ্চয় নিশ্চিত করার প্রয়োজন হত না।

তৃতীয় দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম—নতুন ধরনের প্রযুক্তির উদ্ভাবন, যা কি না একাধারে হবে আধুনিক এবং শ্রমভিত্তিক, শ্রমিককে উদ্বৃত্ত না করে। বামপন্থী তাত্ত্বিকেরা এই 'সোনার পাথর বাটি'র কথা প্রায়শই বলে থাকেন। মাঠে-ময়দানে, কর্মীদের সভায় এইজাতীয় বক্তৃতার প্রয়োজন বোধগম্য হলেও, দেশের আর্থিক সংকট নিরসনে এই প্রস্তাবের কোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে প্রযুক্তির প্রগতি হয় শ্রম লাঘব করার জন্যই। ব্যক্তি যেমন আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে একই পরিশ্রমে অনেক বেশি উৎপাদন করতে পারে, দেশও তেমন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে একই সংখ্যক শ্রমিক বা একই পরিমাণ শ্রম ব্যবহার করে অনেক বেশি উৎপাদন করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, একই পরিমাণ উৎপাদন করতে হলে, পূর্বাপেক্ষা কমসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এমনকী আরও বেশি উৎপাদন করতে হলেও পূর্বসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন না হতে পারে। বিবেচ্য বিষয় হল, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোট উৎপাদন বাড়ছে কিনা।

যদি দেখা যায় যে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে মোট উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু শ্রমিক উদ্বৃত্ত হচ্ছে, তার অন্তর্নিহিত কারণ—আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে মোট কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগ করার মতো মূলধনের অভাব। অতএব, এক্ষেত্রেও মূলধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সঞ্চয়ের বৃদ্ধিই যথার্থ দীর্ঘমেয়াদি নীতি। সেই বৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সব প্রার্থীদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত, বেকারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার নিশ্চয়ই প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন যা বাড়বে, তার একটা অংশ সেই প্রযুক্তিসঞ্জাত কর্মহীনদের প্রয়োজনেই ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু মোট উৎপাদন বাড়লেও, কর্ম-সংকোচন প্রতিরোধ করতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ খর্ব করার অর্থ, মোট উৎপাদনকে বাড়তে না দেওয়া, বর্ধিত উৎপাদনের সঞ্চিত অংশ মারফত মূলধনের বৃদ্ধিকে রোধ করা।

পরিশেষে, একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাতের অভাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীর্ঘমেয়াদি নীতিতে সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমেও জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো স্থান নেই। তাঁরা হয়তো পুরাতন বামপন্থী ধারণা অনুযায়ী মনে করেন যে জনসংখ্যা কোনো আর্থিক সমস্যা নয়। আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে-সাথে জনসংখ্যা আপন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সর্বজনীন সাক্ষরতা, সুস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কার্যক্রমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, যে-কোনো দীর্ঘমেয়াদি নীতির অঙ্গ হওয়া উচিত বলে মনে হয়। এ বিষয়ে চীনদেশের দৃষ্টান্ত "এক দম্পতি-এক সন্তানে"র লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যক্রম তাঁরা কি অনুসরণ করতে পারেন না?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শিক্ষাবিদ এবং প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড. সন্তোষ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৪ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর তিনি পিএইচ. ডি. করেন লনডন স্কুল অভ ইকোনমিক্স থেকে। ড. ভট্টাচার্যের গবেষণাধর্মী মুদ্রিত সন্দর্ভগুলির মধ্যে ক্যাপিটাল লন্‌জিভিটি এবং ওয়েস্টবেঙ্গল ল্যানড রিফর্মের উপর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির

সুধীর চক্রবর্তী

নিম্নবর্গের প্রতি আমাদের ভদ্রলোকদের শ্রেণী-ঘৃণার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে লালনচর্চা। বহু পাতার বহু গ্রন্থ বহু জন লিখেছেন। বহু জন প্রকাশ করেছেন লালনের গান। এঁরা কেউ পেয়েছেন অর্থ; কেউ সম্মান। লালনপন্থীরা প্রকাশ করতে পারে নি তাঁর কোনো গান। কেননা ভদ্রলোকেরা তাঁর সমস্ত কিছু নিয়ে চলে এসেছেন—খাতাগুলি পর্যন্ত। যখন এগুলি ফিরে পাবার দাবি করা হয়েছে, তখন ব্যঙ্গের পিচ্ছিল হাসি হেসেছেন অনেকে। লালন নিয়ে লেখা বই-এর গ্রন্থস্বত্ব আছে; কিন্তু লালনের গ্রন্থস্বত্বের কোনো মর্যাদা ভদ্রলোক সম্পাদকেরা দেন নি। সম্পাদনার নামে লালনের গানকে বিকৃত, পরিবর্তিত এবং নষ্ট করা হয়েছে।

উপরের কথাগুলি কোনো বই থেকে আমি পাই নি, পেয়েছি বহরমপুর থেকে প্রকাশিত একটি লিটল ম্যাগাজিনের চতুর্থ মলাটের বিজ্ঞাপন থেকে। কী প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞাপন, পত্রিকার নামটাই বা কী—এসব কথা পরে বলা যাবে, তবে এটির প্রকাশকাল যে কয়েক মাস আগের—এই কথাটুকু জানিয়ে বলা যেতে পারে, বক্তব্যটি সদ্যতন। তবে এতে উল্লিখিত ভদ্রলোকদের 'ব্যঙ্গের পিচ্ছিল হাসি'র নমুনা পুরোনো ছুয়েকটা বই থেকে আমি উদ্ধার করছি।

ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর "বাংলার বাউল ও বাউল গান" (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৮) বইয়ের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> ছেলেবেলা হইতে দেশের নানা মুসলমান ফকিরের মুখে লালনের গান শুনিয়া আসিতেছি।...১৯২৫ সালে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত লালনশাহী মতের ফকির হীরু শাহের সঙ্গে বাড়ি হইতে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া লালনের সেঁউড়িয়া আখড়ায় উপস্থিত হই।... ঐ সময়ে আশ্রমে রক্ষিত একখানা পুরানো গানের খাতা দেখি। উহা নানাপ্রকারের ভুলে এমন ভর্তি যে, প্রকৃত পাঠোদ্ধার করা বহু বিবেচনা

> ও সময়সাপেক্ষ। আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবিবাবু মশায়' লইয়া গিয়াছেন।...তাহারা আরো বলে যে, সাঁইজীর সেই গানের খাতা পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ অত বড় কবি হইয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, অশিক্ষিত ফকির সম্প্রদায়ের এইপ্রকার গুরুভক্তি দেখিয়া সেদিন মনে-মনে হাসিয়াছিলাম।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। অন্নদাশঙ্কর রায় যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক, তখন কুষ্টিয়া-সন্নিহিত ছেঁউরিয়া আখড়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং লালন-অনুরাগী কাঙাল হরিনাথের ভাইপো ভোলানাথ মজুমদারের দ্বারা অনুরুদ্ধ হন, যাতে লালনগীতির 'আসল পুঁথি-খানি' 'কবিগুরুর কাছ থেকে' ফিরে পেতে তিনি সাহায্য করেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, লালনের ছেঁউড়িয়া আখড়ায় আরেকটি পুঁথি ছিল যা বর্ণাশুদ্ধি ও বিকৃত পাঠে ভরা। উপেন্দ্রনাথ সেটি দেখেছিলেন ১৯২৫ সালে কিন্তু নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি। পরবর্তী কালে কুষ্টিয়ার মুনসেফ মতিলাল দাস লালনগীতি সংগ্রহে তৎপর হন এবং লালনশিষ্য ভোলাই সাহ-র কাছ থেকে গান সঞ্চয় করতে ছেঁউড়িয়া যান। তাঁর অভিজ্ঞতা :

> ভোলাই সার নিকট হইতে গানের পুঁথি আদায় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভোলাই সা বলিল, "দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই।" এ কথার সত্যতা কতদূর কে জানে? কিন্তু ভোলাই কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন। বৃদ্ধের এই মিথ্যা অহমিকা দূর করিয়া তাহাকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম না।[১]

রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখে গেছেন, 'বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।' সম্ভবত এই খাতা লালন ফকিরের গানের খাতা, কেননা ১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে মাঘ সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করে বিদ্বজ্জনসমাজে লালন ফকিরকে পরিচায়িত করেন। পরে নানা রচনা ও বক্তৃতায় লালনগীতির অংশ তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

তথ্যসূত্রে আরও কটি কথা জানা যায়। ড. সনৎ-কুমার মিত্র তাঁর "লালন ফকির কবি ও কাব্য" (১৩৮৬) বইতে উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের আগে ১৩০২ বঙ্গাব্দে সরলাদেবী চৌধুরাণী "ভারতী" পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় "লালন ফকির ও গগন" নামে একটি নিবন্ধ লেখেন এবং তাতে ভদ্রজনসমাজে প্রকাশ্যে লালনের গান প্রথম মুদ্রিত হয়। এমনকি "প্রবাসী"-র 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথের আগে সতীশচন্দ্র দাস (আষাঢ় ১৩২২) এবং করুণাময় গোস্বামী (ভাদ্র ১৩২২) মোট চারখানি লালনগীতি প্রকাশ করেন।

তবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই জুড়ে গেছে লালনের নাম ও তাঁর খাতার বৃত্তান্ত। সেটার সত্যতা কতদূর? তথ্য এই যে, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রয়েছে দুখানি লালনগীতির খাতা। দুটি খাতারই আখ্যাপত্রে পেন্সিল দিয়ে লেখা আছে *Songs of Lalan Fakir—Collected by Rabindranath.* মোট গানের সংখ্যা ২৯৮। গানের পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর অত্যন্ত দুর্বল ও অপরিচ্ছন্ন। তাতে কোথাও-কোথাও রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে সঠিক পাঠ লেখা আছে। কেননা পুঁথিতে শব্দবিকৃতির পরিমাণ বিপুল।

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরসমন্বিত এই খাতাটি দেখতে

গিয়ে (আমি খাতাটি দেখেছিলাম ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে এবং তার ফটোকপি ছেপেছিলাম "শিলাদিত্য" পত্রিকার শারদ ১৩৮৪ সংখ্যায় "বিতর্কিত লালন ফকির" নিবন্ধে) মনে পড়ে দুটি মন্তব্য। প্রথম মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের। লালনের বাউল গান সংগ্রহ করার সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

I remember how troubled they were, when I asked some of them to write down for me a collection of their songs. When they did venture to attempt it, I found it almost impossible to decipher their writing —the spelling and lettering were so outrageously unconventional.

এইজন্যেই বোধ হয় রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম হস্তাবলেপের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু ওই খাতার হাতের লেখাটি কার? কেউ-কেউ বলেছেন, কুষ্টিয়ার ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে ছেঁউড়িয়া আখড়ার খাতা থেকে ২৯৮টি লালন-গীতির প্রতিলিপি করা হয়েছে। কিন্তু খাতাটির দুটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রথমত, গানগুলি খাতার পিছন-দিক থেকে লেখা শুরু হয়েছে যা মুসলমানি পুঁথি পদ্ধতি; দ্বিতীয়ত, বামাচরণ ভট্টাচার্য যদি মধ্যম-শিক্ষিতই হতেন তবে শব্দের অমন গুরুতর বিকৃতি ও বর্ণাশুদ্ধি ঘটত না। কাজেই সন্দেহ নেই, রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত খাতাখানি সরাসরি আখড়া থেকে সংগৃহীত, কিন্তু এই খাতাই কি ভোলাই শাহ-র সেই খাতা যা 'রবিবাবু' নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেন নি? এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করব দ্বিতীয় মন্তব্যটি, যা ড. সনৎকুমার মিত্র-র। ১৩৮৬ সালে নিঃসংশয়ে তাঁর ধারণা :

> পরিশেষে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, রবীন্দ্রভবনের খাতা দুটিই ছেঁউড়িয়ার আশ্রমের আসল খাতা এবং যে ভাবেই হোক তা 'রবিবাবু মশায়ে'র হাতে পৌঁছানোর পর আখড়ায় আর ফিরে যায় নি।

এই মন্তব্য সমর্থন করে বাংলাদেশের গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী "লালন শাহ" (১৩৯৬) বইতে লিখেছেন :

> সনৎকুমার মিত্রের এই অনুমান যে সঠিক সে-বিষয়ে আমরা এখন নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতার হস্তাক্ষর ও বর্তমান লেখক-সংগৃহীত জনৈক লালনশিষ্য কর্তৃক লিপিকৃত লালনগীতির সূচীপত্রের হস্তাক্ষর অভিন্ন।...অতএব এই সিদ্ধান্তই সমীচীন ও সঙ্গত যে রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের মূল খাতাই সংগ্রহ করেছিলেন যা এখন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত আছে। বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনের গান নকল করালেও সেই খাতার সন্ধান এখনো মেলে নি।

এই সিদ্ধান্তের পর আবুল আহসান সবিস্ময়ে আরও লক্ষ করেছেন যে, "প্রবাসী" পত্রিকায়—

> ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত চার কিস্তিতে রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালনের মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। এই কুড়িটি গানের মধ্যে মাত্র আটটি গান রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত খাতা থেকে গৃহীত। এ-থেকে ধারণা হয় রবীন্দ্রনাথ অন্য সূত্র অর্থাৎ লালনশিষ্য কিংবা শিলাইদহের বাউলদের নিকট থেকে লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন।

লালনগীতি, লালনগীতির খাতা, রবীন্দ্রনাথের সে প্রসঙ্গে সঠিক ভূমিকা, নিরুদ্দেশ একটি পুঁথি—এইসব নিয়ে যে-বিতর্ক জমে উঠেছে, বা আপাত সমাধান হয়েছে, সে সম্পর্কে সুধীজন প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, লালন ফকির বিষয়ে এত সব বিতর্কের ধরতাইয়ে আমরা যাব কেন?

আসলে এই বিতর্ক আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির

এক পরম্পরাগত দায়, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে উচ্চ-বর্গের কৌতূহল এবং সাম্প্রতিক সাবঅলটার্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি। শিকড়ের সন্ধান তো আমাদের করতেই হবে এবং তার ফলে অনিবার্য হয়ে উঠবে ধূলোমাটির স্পর্শ। সেই ধূলোমাটির স্তর পেরিয়ে আমরা তবেই পাব স্বচ্ছ লোকজীবনের ভিত্তি ও বিন্যাস, যা আত্ম-সন্ধানের নামান্তর। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে, লালন ফকির বিষয়ে যথাযথ মূল্যনির্ধারণে আমাদের পেরোতে হবে আরও অনেক বিতর্কের পর্যায়। সে বিতর্ক শুধু তাঁর গানের শুদ্ধসত্বতাকে নিয়ে বা পুঁথির অকৃত্রিমতাকে ঘিরে নয়, বরং অনেক বড়ো মাপের জিজ্ঞাসায় ও প্রযত্নে। সেখানে প্রশ্ন উঠবে লালনের জাতিসত্তার, তাঁর ধর্মধারণার, গুপ্তসাধনার জটিলতা নিয়ে। সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে তাঁর গানের ব্যক্ত বিশ্বাস ও আধুনিক মননের স্বয়ম্ভরতা নিয়ে। দেখা যাবে লালন তাঁর লোকায়ত জীবনসাধনার পরম্পরা মেনে নিয়েও কেমন করে হয়ে উঠেছেন সর্বাধুনিক উচ্চারণের গীতিকার।

কিন্তু সেসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে আরেকবার ফিরে যাব প্রথমে উদ্ধৃত সেই লিটল ম্যাগাজিনের সন্ধানে বিজ্ঞপ্তিতে। সেখানে নিম্নবর্গের প্রতি ভদ্র-লোকদের শ্রেণীঘৃণার প্রসঙ্গে লালনচর্চার কথা উঠেছে। তারপরে ঘোষণা করা হয়েছে এক অত্যাশ্চর্য সংবাদ :

> অবশেষে লালনের মূল খাতা থেকে অনুলিপি করা (১২৯৯ সালের) তাঁর দত্তকপুত্র ভোলাই শা'র খাতাটি পাওয়া গেছে। এটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর পরিজনদের দ্বারাই এটি রক্ষিত ছিল। মোট গানের সংখ্যা ৩৪৭। পুঁথির ঢং-যে, আঞ্চলিক ভাষায়, অনন্য ছন্দে ও ধ্বনিঝংকারে রচিত লালনের গানের লেখা-ঐতিহ্যের এটিই একমাত্র প্রামাণ্য উৎস। একে ব্যবহার করে, সংস্কৃত করে, প্রবাসীর ২০টি গান রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন।...দীর্ঘদিন পরে মূল পাণ্ডুলিপি প্রতিলিপি সহ প্রকাশিত হতে চলেছে।[২]

সানন্দ বিস্ময়ের এই সংবাদটুকু আপাতত জানিয়ে আমরা লালন প্রসঙ্গে সরাসরি চলে যেতে পারি।

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক) কুষ্টিয়ার উপকণ্ঠে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় লালন ফকির দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক "হিতকরী" পত্রিকার একটি বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধে। এটি বেরোয় লালনের মৃত্যুর পনেরো দিন পরে, ১৫ কার্তিক তারিখে ১ম ভাগ ১৩ সংখ্যায়। "হিতকরী"র কোনো সংখ্যায় সম্পাদকের নাম থাকত না, তবে এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন লালনের শুভার্থী মীর মশাররফ হোসেন। লালনের মৃত্যু-সংক্রান্ত খবর সহ সম্পাদকীয় এই নিবন্ধে কোনো লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু লেখা ছিল, লালন ফকির '১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।' এই ১১৬ বছরের হিসাব মেনে নিয়ে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি লালনের জীবন ১৭৭৪ থেকে ১৮৯০ কালপর্বে স্থাপন করেছেন। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, তাঁর মৃত্যুসাল সম্পর্কে কোনোই ধূসরতা নেই কিন্তু জন্মসাল সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, কারণ লালন মানুষটি এবং তাঁর রচনা ও জীবনদৃষ্টি বিচার করতে গেলে তাঁকে শতাব্দী-উত্তীর্ণ ব্যক্তি না মানলেও কোনো ক্ষতি হয় না।

কিন্তু তাঁর বর্তমান লোকপ্রিয়তা এবং বিস্তৃত প্রসিদ্ধি তথা লালনগীতির প্রচার-প্রচলন নিঃসন্দেহে ব্যাহত হত যদি না লালনের আখড়াটি থাকত কুষ্টিয়াতে এবং সেখানে না-থাকত ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এবং ঠাকুরদের আসা-যাওয়া। ঠাকুর-পরিবার লালনের গানের গভীরতা ও প্রকাশসারল্য নিয়ে মাতামাতি না করলে তাঁর নাম সীমায়িত থেকে যেত কুষ্টিয়ার সন্নিহিত অঞ্চলের মারফতি বাউলদের

কণ্ঠে আর বিলীয়মান আখড়ার কিছু শিষ্যসেবকের আন্তরিক স্মরণবৃত্তে। তাঁর গান পেত না প্রসারণ ও প্রচার, প্রার্থিত মর্যাদা ও মূল্যবত্তা। "হিতকরী" পত্রিকার ১ম ভাগ ১৩ সংখ্যার ন্যূনতম প্রচার মিলিয়ে যেত বিস্মৃতিপ্রবণ গ্রামজীবনের নির্মম হিমঘরে। ইতিহাস ঘাঁটলে আমার এই মন্তব্য বোঝা যাবে। সে ইতিহাস এইরকম।

অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর যত্নকৃত[৩] "লালনচর্চার ইতিহাস" অধ্যায় পড়ে সতর্ক অনুধাবনে দেখা যায় লালনের জীবিতকালে ১৮৭২ সালের অগস্ট মাসের "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা"-য় 'জাতি' নামে এক অস্বাক্ষরিত নিবন্ধে সর্বপ্রথম লালনের উল্লেখ পাওয়া যায় এই ভাষায়,

> লালন শা নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত।…৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকরে করে না সেকথা বলা বাহুল্য।

এখানে দুটি বিষয় পাঠকদের মনে রাখতে বলব। প্রথমত, লালনকে বলা হয়েছে কায়স্থ এবং দ্বিতীয়ত, তাঁকে বাউল বলা হয় নি।

প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা"-র এই নিবন্ধ রচয়িতা তথা লালনের উল্লেখকার কে? সবাই জানেন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬)। তিনি ছিলেন লালনের বন্ধু ও সমর্থক। কিন্তু জানা যায় না অস্বাক্ষরিত রচনাটি কার। ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত কাঙাল হরিনাথের "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" রচনায় লালনের একটি গান ('কে বোঝে সাঁয়ের লীলাখেলা') সম্পূর্ণত ব্যবহার করা হয়েছে। পরে এই হরিনাথ লালনের গানের আদর্শে 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতায় বহু গান লেখেন এবং শখের বাউলের দল বেঁধে সেইসব গান প্রচার করেন। বাঙলা গানের পরম্পরায় ফিকিরচাঁদি গানের ভাব ও সুরের গড়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর "পথের পাঁচালি" ফিল্মে ফিকিরচাঁদের একটি প্রসিদ্ধ গান ('হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল') ব্যবহার করে তাকে প্রসিদ্ধতর করেছেন। যাই হোক, এই ভাবুক হরিনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত সত্তা ছিল সম্পাদক হরিনাথের। তাই "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা"-র ফাইল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ আছে) ঘাঁটলে দেখা যাবে নির্ভীক হরিনাথ কুষ্টিয়ার দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর পক্ষে কলম ধরতেন, তাদের উপর শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেন নিজের কাগজে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর "লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা ও আসাম" (১৩৮৫) বইতে অপ্রকাশিত কাঙাল হরিনাথের 'দিনপঞ্জি'-র সাক্ষ্য মেনে উল্লেখ করেছেন যে একবার "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা"য় জমিদারদের প্রজাপীড়নের খবর পড়ে জমিদারদের প্ররোচিত লাঠিয়ালরা কাঙালকে উচিত শিক্ষা দিতে আসে। সাধক লালন তাঁর দলবল নিয়ে লাঠি হাতে বিপন্ন বন্ধু কাঙালকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।[৪] এই খবরের সত্যাসত্য বলা শক্ত। কারণ 'দিনপঞ্জি' আজও মুদ্রণের মুখ দেখে নি। হেমাঙ্গবাবুকে আমি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান তাঁর বন্ধু লোকসংস্কৃতিবিদ্ অরুণকুমার রায়ের কাছে কাঙালের 'দিনপঞ্জি'-র পাণ্ডুলিপি আছে এবং অরুণবাবুই তা প্রকাশ করবেন। তারপরে এত বছরের মধ্যে তা প্রকাশ পায় নি। এখন হেমাঙ্গ ও অরুণকুমার উভয়ই প্রয়াত। পাণ্ডুলিপিটি কোথায়?

ইতিহাস ঘাঁটলে লালন সম্পর্কে এইরকম খণ্ড-ছিন্ন কিছু খবর মিলবে। যেমন দেখা যায় লালনের শুভার্থী মীর মশাররফের একটি গানে লালনের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু এ সবই বিক্ষিপ্ত প্রয়াস, যা আতস কাঁচ দিয়ে দেখে, তবে তাতে গৌরবখ্যাপন করা চলে। তা ছাড়া এসব প্রয়াসই লালনের বন্ধুগোষ্ঠীর বা কুষ্টিয়ার সজ্জনবৃত্তে আবদ্ধ। তাই ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে, বাঙলার মূল বিদ্বজ্জনের প্রবাহে, বৃহত্তর বাঙালিদের কাছে লালন প্রথম

পরিচিতি পান ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত "ভারতী" পত্রিকায় সরলা দেবীর রচনায়। লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে, ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যায়, "লালন ফকির ও গগন" নামে নিবন্ধটি বেরোয়। এতে ৮খানি লালনের গান, ২টি গগনের এবং ১টি ভণিতাহীন গান মুদ্রিত হয়। লালনের সংক্ষিপ্ত এক পরিচিতি সরলা দেবী এ লেখায় জুড়ে দেন। পরিচিতিটুকু তিনি পান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র কাছে।

সরলা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীর কন্যা। তাঁর পক্ষে লালন ফকিরের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ খুব একটা কাকতালীয় ব্যাপার বোধহয় নয়, যখন দেখি তাঁর নেশাই ছিল মাঝিমাল্লা বা পল্লী-গায়কদের কাছ থেকে গান শোনা, তা সংগ্রহ ও স্বরলিপিবদ্ধ করা। এভাবেই তাঁর "শতগান" (১৩০৭) গীতসংকলনে রয়ে গেছে অনেকগুলি লৌকিক গান, যার কিছু-কিছু ভণিতাহীন, অচিহ্নিত। সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

> আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম।…কর্তাদাদা-মশায় চুঁচড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে-মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মতো সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন-যেমন আমি শোনাতুম —অমনি-অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো-কখনো তার কথাগুলিও কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে এক-একখানি নিজের গান রচনা করতেন।

সরলার সব মন্তব্য অবশ্য সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ সরলার কাছে শোনা বেশ কটি লৌকিক গানের সুর নিয়ে নতুন গান বেঁধেছেন অনেক পরে। যাই হোক, এখানে উল্লিখিত কর্তাদাদামশায় (দেবেন্দ্রনাথ) ও বোটের মাঝিমাল্লার প্রসঙ্গ থেকে অনুমান হয় মাঝিমাল্লারা হয়তো শিলাইদহেরই মানুষ ছিল, সেই-জন্যই তাদের কণ্ঠে ছিল বাউল গানের স্বতঃ সঞ্চয়। সেখান থেকেই কি পেলেন লালনের গান? মৌলবী আবদুল ওয়ালী নামে একজন লালনের গানের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ১৮৯৮ সালে যে, সেই গান 'sung by boatmen and others'। অবশ্য একটি প্রত্যক্ষ সূত্রও পাচ্ছি। স্বয়ং সরলা দেবী জানিয়েছেন "ভারতী" পত্রিকায়:

> কুষ্টিয়ার সন্নিহিত প্রদেশে সামান্য বৈরাগীর মুখে তাঁহার (অর্থাৎ লালন) ও তাঁহার কোনো শিষ্যের রচিত কতিপয় গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাদের কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অধিক সংগ্রহের সময় ছিল না, যে কটি পাইয়াছি তাহাই পাঠকদের উপহার দিতেছি।

এরপরে মুদ্রিত হয়েছে গগন ও লালনের কটি গান। লালনের গান সম্পর্কে সরলা দেবী আলাদা কোনো মন্তব্য করেন নি (কেবল তাঁকে চিহ্নিত করেছেন 'ভগবৎপ্রণয়ী' বলে) কিন্তু গগনকে নির্দেশ করেছেন লালনশিষ্য বলে এবং গগন সম্পর্কে বাড়তি মন্তব্য করেছেন, 'পাঠক এই গগনের পরিচয় পাইলে বিস্মিত হইবেন। শুনিয়াছি গগন একজন ডাকহরকরা এবং এখনও জীবিত।'

এই প্রসঙ্গে আমারও একটি বাড়তি তথ্য পরিবেশন করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তা এই যে, সরলাদেবী-সংগৃহীত গগনের দুটি গানের সুর যা "ভারতী"তে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথকে এত দূর মুগ্ধ করেছিল যে ১৩১২ সালে (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে সেই সুরে দুটি নতুন গান বাঁধেন। গগনের গানদুটির প্রথম পংক্তি হল—'আমি কোথায় পাব তারে' এবং 'ও মন, অসার মায়ায় ভুলে রবে'। এই দুটির ভাঙা রবীন্দ্রগান হল যথাক্রমে 'আমার সোনার বাংলা' এবং 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক'। বাউলগানের সুরবিন্যাসের ছক কেমন করে রবীন্দ্রগীতিপ্রতিভার স্পর্শে দেশোদ্দীপনার গানে বদলে গেছে সেটা স্বতন্ত্র বিস্ময়ের প্রসঙ্গ।[৫] তবে লক্ষণীয় যে, গগনের গানের সুর ও চাল রবীন্দ্রনাথকে যতখানি টেনেছিল লালনের গানের সুর ততটা টানে

নি। তাই লালনের সুর ভেঙে তিনি কোনো গান বাঁধেন নি। অথচ লালনগীতি তাঁর ভালো লেগেছে, সে কি তার ভাবমূল্যে ও প্রকাশভঙ্গির অনন্যতায়? কথাটি ভালো করে বোঝার পক্ষে সহজ উপায় হল লালন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা পরোক্ষ মন্তব্য ও উদ্‌ধৃতিগুলি দেখা।

"প্রবাসী" পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে লালনের গান মুদ্রণ (১৩২২) রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ কাজ। গানগুলি প্রকাশ করে তিনি লালনগীতির অন্তঃসার ভদ্র পাঠকসমাজে বোঝাতে চেয়েছিলেন। ব্যাপারটি, যাকে বলে, থিমেটিক। তার আগে ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসের "প্রবাসী" পত্রে ধারাবাহিক "গোরা" উপন্যাসের কিস্তিতে তিনি লিখেছিলেন :

> আলখাল্লা-পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—
>
> খাঁচার ভিতর অচিন-পাখি কেমনে আসে যায়
> ধরতে পারলে মনো-বেড়ি দিতেম পাখির পায়।
>
> বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন পাখির গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর-রাত্রে যেমন শীত-শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটি আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন গুন করিতে লাগিল।

এর পরে ১৩১৯ সালে "জীবনস্মৃতি" বইতে রবীন্দ্রনাথ লালনগীতির ঠিক ওই দুই পংক্তি উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন :

> দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে?

এই একই গান আবার তাঁকে উদ্ধৃত করে যখন ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে ভাষণপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এত দূর বলেন যে,

> That this unknown is the profoundest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English Poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird.

তিনটি উদ্ধৃতিতেই রবীন্দ্রনাথ লালনের একটিমাত্র গান ব্যবহার করেছেন। অন্য বহুবিধ গান কেন তাঁর মনকে ভাবের দিক থেকে টানল না তা বোঝা কঠিন। অথচ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত লালন-গীতির খাতা দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে গানগুলি পড়েছেন, কিছু-কিছু শব্দের শুদ্ধপাঠও স্বহস্তে লিখে রেখেছেন। লালনের গান "প্রবাসী"তে প্রচারও করেছেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে যেখানে-যেখানে লালনগীতি উদ্‌ধৃত করেছেন (আগের নমুনাগুলি লক্ষণীয়) সেখানে লালনের নাম উল্লেখ করেন নি। উল্লেখ করেন নি তবু লালনের নাম আছে এমন নমুনা রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ছন্দের প্রকৃতি" (১৩৪১) প্রবন্ধ থেকে দেওয়া যায় :

> প্রাকৃত-বাংলার ছুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা-ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্‌ধৃত করে দিই।
>
> আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
> সে কি আর জপে মালা।
> নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।

আর-একটি

> এমন মানব-জনম আর কি হবে।
> যা কর মন ত্বরায় কর
> এই ভবে।

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশাকরি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।

এখানে লালনের গানের সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃতি স্থান বাঁচাতে আমি দিলাম না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পুরো গান দুটিই যেহেতু ব্যবহার করেছেন তাই তাতে লালনের নামের ভণিতা রয়ে গেছে।

ওই "বাংলা ছন্দের প্রকৃতি" নিবন্ধের আরেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ 'বাঙলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা'-র নমুনা বোঝাতে, সেই ভাষার প্রাণবানতার লক্ষণ হিসাবে তুলেছেন লালনের আরেকটি গানের ('কোথা আছে রে দীনদরদী সাঁই') কিছু অংশ। যেমন—

> চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
> কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
> কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
> বসে নিগম ঠাঁই।
> এখানে না দেখলেম তারে
> চিনব তবে কেমন করে,
> ভাগ্যেতে আখেরে তারে
> চিনতে যদি পাই।

রবীন্দ্রনাথ আরও কোথাও-কোথাও সংক্ষেপে লালনপ্রসঙ্গ বা লালনগীতির কথা টেনেছেন, তার তালিকা আপাতত অবান্তর। বলার কথা কেবল এটাই যে, লালনের আজকের যে প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি, তার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহিতা। তথ্যত উল্লেখ-যোগ্য যে মূলত তাঁর উদ্‌যোগের প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী কালে অনেক পণ্ডিত ও মরমি ব্যক্তি লালন সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং সমগ্র বাঙলায় লালনগীতির সংগ্রহ এবং লালনজীবনের তথ্য বিষয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা চলতে থাকে, যা আজও ক্ষান্তিহীন।

লালনজীবনের যে বিবরণ বহুদিন যাবৎ প্রচারিত ছিল তাতে অলৌকিকতা বা মিথের ভূমিকা বেশ আশ্চর্যরকম কম। সাধারণত নিম্নবর্গের সমাজভাবনায় এমন ঘটে না। সেখানে নেতাকে নিয়ে, তাঁর নানা কল্পিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মিথ গড়ে ওঠে। রণজিৎ গুহ তাঁর "নিম্নবর্গের ইতিহাস" ("এক্ষণ", ১৫ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৯) নিবন্ধে এরই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, নিম্নবর্গের এমনতর মিথনির্মাণের 'ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়।' এইভাবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আউলচাঁদকে গঙ্গাশোষক (কমগুলুতে নাকি গঙ্গা পুরেছিলেন)-রূপে আঁকা হয়েছে, সাহেবধনীদের গুরু চরণচাঁদকে দেখানো হয়েছে বাকসিদ্ধরূপে। এইসব গৌণধর্মের সংগঠন বেশ মজবুত, শিষ্যও অনেক। গুরুবংশ বহু ক্ষেত্রে পরম্পরা-ভিত্তিক ও মান্যতাযুক্ত। রোগনিরাময়ের এক ধরনের অলৌকিক শক্তির কথাও গুরুদের সম্পর্কে রচিত থাকে। মন্ত্রতন্ত্রও সম্প্রদায়ভেদে আলাদা-আলাদা। প্রশ্ন ওঠে, সেই অর্থে লালনশাহি মতবাদ বলে মজবুত কিছু আছে কি? নাকি তাঁর প্রয়াণেই শেষ হয়েছে একটা ধারা?

প্রাসঙ্গিক সেই প্রশ্নের বিস্তারে এখনই না গিয়ে আমরা বরং লালন-জীবনের বহুপ্রচারিত কাহিনী-অংশটুকুর মূল মর্মে একটু চোখ বুলিয়ে নিতে পারি। খুব সহজে বোঝা যায়, লালনজীবনী সংগ্রাহকদের দ্বারা যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তাতে বেশ খানিকটা নাটকীয় উপাদান আছে। তাই এ শতকে লালন সম্পর্কে অন্তত দুখানি উপন্যাস, পাঁচখানি নাটক, এবং দুটি ছোটোগল্পের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। আবুল আহসান চৌধুরীর বইয়ের তথ্যসূত্রে দুই বাঙলার সেই তালিকা এখানে পেশ করা যাক প্রথমে। ব্যাপারটি কৌতূহলজনক এইজন্য বাঙলার আর কোনো

লৌকিক ভাবসাধককে নিয়ে আধুনিক ভদ্রলোকদের এহেন প্রয়াসের তথ্য সামনে নেই। লালনজীবন-ভিত্তিক রচনাবলী এইরকম—

উপন্যাস ॥ বাউলরাজা : রণজিৎকুমার সেন। কলকাতা, ১৯৬৬
বাউলরাজার প্রেম : পরেশ ভট্টাচার্য। কলকাতা, ১৯৮৬

নাটক ॥ লালন ফকির : আসকার ইবনে শাইখ। ঢাকা, ১৯৬৯
লালন ফকির : মন্মথ রায়। কলকাতা, ১৯৭১ / ১৯৮২
সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির : দেবেন্দ্রনাথ রায়। কলকাতা, ১৯৭২
লালন ফকির : কল্যাণ মিত্র। ঢাকা, ১৯৭৭
বাউলরাজা : রণজিৎকুমার সেন। "চিত্রিতা" পত্রিকা। কলকাতা (?)

ছোটোগল্প ॥ লালন ফকিরের ভিটে : সুনির্মল বসু। কলকাতা, ১৯৩৬
দুই মুসাফির : শওকত ওসমান। ঢাকা, ১৯৬৪।

ব্যাপক অনুসন্ধানে এই তালিকা স্ফীত হবে নিশ্চয়ই। তথ্যে আরো জানা হচ্ছে, ১৯৭০ সাল নাগাদ সৈয়দ হাসান ইমাম ঢাকা থেকে "লালন ফকির" নামে একটি চলচ্চিত্র করেছেন। গ্রামদেশে লালন ফকিরের নামে যাত্রাপালা নিশ্চয়ই হয়েছে বলে অনুমান করি। গত দুবছর ধরে নদীয়া জেলার একটি পুতুলনাচের দল গ্রামে গ্রামান্তরে লালন ফকিরকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে চলেছেন।

লালন ফকিরের জীবনঘটনার নাটকীয়তা, তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর গানের সমৃদ্ধ জগৎ বাঙালির কাছে এক সম্পন্ন উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার যে যথার্থভাবে আমরা বুঝেছি বা নিজের জীবনে সঠিক গ্রহণ করেছি তা হয়তো নয়, তবু লালনকে সকলের সামনে তুলে ধরার সগর্ব নানা উদ্যম লক্ষ করবার মতো। যেমন উল্লেখযোগ্য এই সংবাদ যে, ১২৬৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে লালনগীতির অন্তত চারখানি ইংরাজি অনুবাদ-পুস্তক বেরিয়েছে ঢাকা থেকে। ভারতের কূটনৈতিক মুচকুন্দ দুবে কয়েকটি লালনগীতির হিন্দি অনুবাদ করেছেন। ঢাকা থেকে কাজী নাসির এবং সুধীন দাশ লালন-গীতির দুখানি স্বরলিপি-বই প্রকাশ করেছেন। জন-প্রিয় লালন-গানের অনেকগুলি ক্যাসেট ও দীর্ঘবাদন রেকর্ড বাজারে চলছে। ১৯৯০ সালে অক্টোবরে বাংলাদেশ সরকার লালনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে একটি লালন প্রতিকৃতির ডাকটিকিট ও ফার্স্ট ডে কভার ছেপেছেন। দুই বাঙলায় লালন সংক্রান্ত বই লেখা হয়েছে অনেক এবং তাতে লালনবিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। সেই বিতর্কের অনেকগুলি সূচীমুখ। যেমন—লালন ফকির কে? তাঁর জাতি কী? তিনি কি আগে হিন্দু পরে মুসলমান অথবা জন্মতই মুসলমান? তাঁর জন্মবাস্ত কোথায়? তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই কোথাকার মানুষ? লালন কি সুফী সাধক না বাউল? তাঁকে কি প্রকৃত মুসলমান বলা যায়?

এইসব অমীমাংসিত বিতর্ক ও অনিঃশেষ কৌতূহল প্রমাণ করে যে লালনের জীবনঘটনায় বেশ কিছু রহস্যের উপাদান এবং তাঁর গানে রয়ে গেছে সজীব কিছু সত্যের সারাংসার। তা না হলে এতদিন ধরে এত মানুষ তাঁকে নিয়ে এত কথা বলে চলেছেন কেন? সেই সঙ্গে তাঁকে বাঙালি জাতিসত্তার প্রশ্নে সম্প্রতি জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। হালফিলের অসাম্প্রদায়িক মুক্তবুদ্ধির যে-চেতনা বাঙালি বুদ্ধি-জীবীদের খুব রোচক আলোচ্য, লালনের গানের মর্মবাণী তাতে বেশ খানিকটা উজ্জীবন আনে। সেই দিক থেকে লালন প্রসঙ্গ সর্বাধুনিক ভদ্রলোকদের মনোযোগের একটা বড়ো আশ্রয়। যদিও লালন তাঁর সমগ্র জীবনে ভদ্রলোকশ্রেণীর জন্য কিছু বলার দায় নেন নি, তাঁর অবস্থানও ছিল অন্ত্যজ হিন্দু-

মুসলমানের অন্তর্গূঢ় মিলন-স্বপ্নের মানবিক প্রশ্নে। ভদ্রেতর জনসাধারণের ধর্মধারণার ভুলভ্রান্তি, আচার-মার্গের দুর্বল দিক, কুসংস্কারের অন্ধবিশ্বাসের গড্ডালিকা তিনি রুখতে চেয়েছিলেন। আমাদের সমাজকর্মী ও রাজনীতির মানুষরা লালন-বাণীকে তত মান্যতা দেন নি, প্রয়োগ করেন নি তাঁদের তত্ত্বে ও লক্ষ্যে। কোন্ অলক্ষ্য রন্ধ্রপথে লালন আজ হয়ে উঠেছেন যেন সাহিত্যের সামগ্রী কিংবা ধর্মব্যবসায়ীর অস্ত্র।

এই দ্বিতীয় লক্ষণ সংকট টেনে এনেছে। সে কথা ঠাণ্ডা মাথায় বোঝা দরকার। লালন ফকিরের জীবন ও গানই তাঁর প্রাথমিক জনপ্রিয়তার কারণ, বিশেষত সেকালের নিম্নবর্গে ও গ্রামীণ বঙ্গে। উনিশ শতকের রুচিমান শিক্ষিত সমাজে তিনি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন কাঙাল হরিনাথ, মীর মশাররফ ও জলধর সেনের প্রয়াসে। ঠাকুরপরিবার তাঁর প্রচারে ব্যাপক অংশ নেন। লালনের একটিমাত্র বাস্তব প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কনে। তাঁর শিষ্য-সেবক, তাঁর গান পরিবাহিত হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে গ্রামীণ সংস্কৃতির স্বতশ্চল প্রবাহে। ছেঁউড়িয়ায় তাঁর অকুলীন নম্র সমাধি দরাদি জনকে টেনেছে—সেই দরাদিদের জাতপাতের পরিচয় মুখ্য ছিল না। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ "হতকরা" পত্রিকায় এইভাবে ছিল যে—

> মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার নাই।···তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না।

এককালের সামান্য লালনের ছেঁউড়িয়া আখড়া গড়ে-ওঠার এবং তার বহু কাল পরে লালনসমাধির সৌধবিন্যাসের ক্রমিক ইতিহাস লক্ষ করলে একটা সূক্ষ্ম শহুরে বুদ্ধির কৌশল চোখে না পড়ে পারে না, সেই সঙ্গে দ্বিজাতিতত্ত্বের এক নিগূঢ় বয়ন। ব্যাপারটা এইরকম। আবুল আহসান চৌধুরীর বই থেকে তথ্য নিয়ে বলা যায়—

> ছেঁউড়িয়া মৌজায় লালন-ভক্ত মলম শাহ কারিকর লালন ফকিরকে সাড়ে ১৬ বিঘে জমি দান করেন। এই দানকৃত জমির প্রায় অর্দ্ধাংশের ওপর লালনের আখড়া গড়ে ওঠে। স্থানীয় কারিকর-শ্রেণীর ভক্তবৃন্দ লালনের বসবাস ও সাধনার জন্য এই আখড়ার চতুর্দিকে বারান্দা-যুক্ত একটি পূর্বদুয়ারী চারচালা বড়ো খড়ের ঘর তৈরী করে দেন। লালন পরে, যেখানে এখন তাঁর সমাধি আছে, সেখানে একটি গোলাকৃতি বড়ো খড়ের ঘর তৈরী করে বাস করতে থাকেন। এই ঘরেই তাঁর ভজন-সাধন চলতো। মৃত্যুর পর এখানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

মৃত্যুর পরেই লালনশিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চরমে ওঠে। জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছে লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের এক সকাতর আবেদনপত্র থেকে এই বিসম্বাদের চিত্র পাওয়া যায়।[৩] সেই চিঠি এখানে ছাপার প্রয়োজন নেই। তবে তার সারকথা হল লালনের অন্য দুই শিষ্য ভোলাই শাহ ও শীতল শাহ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং মনিরুদ্দীনকে তাঁরা বিতাড়িত করতে চান। এই চিঠি থেকে আরও জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ লালনের সমাধিতে একটা পাকা বাড়ি করতে চেয়েছিলেন। মনিরুদ্দীন লিখেছেন—

> আজ এই দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিতেছি যে, আমার পরমারাধ্য গুরু লালন সাহা ছাহেবের সমাধি পাকা এমারত করাইবার অনুমতি হুজুরের সরকার হইতে পাইয়াছিলাম। হুজুর বিলাত হইতে আসিয়া শ্রীযুক্ত মাননীয় নগেন্দ্রবাবু মহাশয়ের প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সমাধিস্থানে গমনপূর্বক দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাপ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং এষ্টিমেট প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। দুর্ব্বৎসর দেখিয়া

শিলাইদহার কাছারির কর্মচারি মহাশয়দিগেরা কয়েক মাসের জন্য সমাধি পাকা করান বিষয় স্থগিত রাখিয়াছিলেন।

চিঠি থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে ইত্যবসরে ভোলাই ও শীতল শাহ তাড়াতাড়ি 'মাটির কাদা দিয়া গাঁথনি' করে একটি ঘর বানিয়ে ফেলেছেন। আবুল আহসান প্রসঙ্গত জানিয়েছেন চুন-সুড়কির গাঁথনিতে পাকা সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন ভোলাই ও শীতল। সেই সমাধিসৌধ ১৯৪৮ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রচণ্ড বজ্রপাতে দক্ষিণদিকের অংশে ভেঙে পড়ে। এর পরে ১৯৪৯ সালে 'লালন শাহ আখড়া কমিটি'-র পক্ষে ভেঙে-পড়া সৌধ আবার তৈরির চেষ্টা চলে কিন্তু টাকার অভাবে ছাদ ও পলেস্তারা হয় নি। লক্ষণীয় যে, সে দেশে তখন পাকিস্তান কায়েম হয়েছে কিন্তু লালন শাহ সম্পর্কে ইসলামি ধর্মধ্বজী বা প্রশাসকদের তেমন আগ্রহ জাগে নি।

ফলে, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ওইভাবেই থেকে যায় লালনের সমাধিস্থান, মহিমাহীন ও ব্রাত্য। তারপরে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের ম্যানেজিং ডিরেকটর এক ব্রাহ্মণ সন্তান, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, আট হাজার টাকা খরচ করে সৌধনির্মাণের প্রয়াস নেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় নতুন গৃহ তৈরি হবে বলে পুরানো বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়, কিন্তু কোনো কারণে নতুন সৌধটির গড়ে ওঠে না।

কিন্তু এর পরেই চিত্র বদলে যায়। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রস্তাবে ১৯৬৩ সালে গড়ে ওঠে পাকিস্তান সরকারের অর্থানুকূল্যে লালন শাহের সুদৃশ্য সৌধ ও মাজার, সৃষ্টি হয় "লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র"। তৎকালীন গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এম. এ. হাইয়ের নকশা অনুসারে সুরম্য ও বিশাল যে সমাধিসৌধ গড়ে ওঠে তার আদর্শ ছিল দিল্লীর মুসলিম সাধক হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মকবরা। একেই কি বলব লালন ফকির প্রসঙ্গটির প্রথম ইসলামিকরণ?[৭] এখনই অবশ্য সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসে নি। তবে মুক্তবুদ্ধির মানুষ ছুয়েকজন এই ঘটনাটি লক্ষ রেখেছেন। অলক্ষে তাঁরা যেন দেখতে পেয়েছেন দ্বিজাতিতত্ত্বের একটা বানিয়ে-তোলা ছক। সে যাই হোক, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মনে করেছিলেন লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র স্থাপন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে এক শ্লাঘনীয় গৌরবজনক কীর্তি। কথাটা আমাদেরও, যদিও সেই লোকসাহিত্য কেন্দ্র কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন বলে আমরা শুনি নি। কেবল প্রতিষ্ঠানের নামবদল হয়েছে। ১৯৬৩ সালের "লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র" ১৯৭৬ থেকে হয়েছে "লালন একাডেমী"। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখান থেকে লালনগীতির কোনো নির্ভরযোগ্য সংকলন বার হয় নি, লেখাহয় নি গ্রহণযোগ্য লালন-জীবনী, প্রকাশ পায় নি লালনগীতির ক্যাসেট বা অনুশীলনযোগ্য শুদ্ধ লালন ঘরানার স্বরলিপি।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে একটা বড়ো মত-বদলের পালা, বিশেষত বাংলাদেশে। ১২৯৭ সালের "হিতকরী"-র সম্পাদকীয় নিরঙ্ক থেকে লালন ফকিরের যে-জীবনী এবং তাঁর হিন্দু উৎসের কথা সবাই জানতেন সে সম্পর্কে সংশয় সন্দেহ ঘনাতে থাকে পঞ্চাশের দশকে। ১৩৫৫ সালে বসন্তকুমার পাল লালন ফকিরের বিস্তৃত পরিচিতি লেখেন "প্রবাসী" পত্রে, পরে পূর্ণাঙ্গ বই ("মহাত্মা লালন ফকির") লেখেন ১৩৬২ সালে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মতিলাল দাস প্রমুখ অগ্রণী লালনগবেষকরা সকলেই সেই জীবনবিবরণ জানতেন এবং মানতেন লালন ভাঁড়ারা গ্রামের অর্থাৎ কুষ্টিয়ার মানুষ, জন্মত হিন্দু কিন্তু নানা ঘটনাপরম্পরায় তিনি হয়ে যান জাতিহীন বাউল বা ফকির। কিন্তু একদল নতুন গবেষক বলতে চাইলেন জন্মসূত্রেই মুসলমান। ব্যথিত মনসুরউদ্দীন ১৩৭১ সালে লক্ষ করলেন :

> ইদানীং এখানে দেখা যাইতেছে অনেকেই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া লালন শাহকে জন্মকাল হইতে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছেন

> ও লালন শাহের জন্মস্থান যশোহরে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল ইহারা সকলেই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া ছিলেন।

মনসুরউদ্দিনের প্রতিবাদ করে তরুণ গবেষক লুৎফর রহমান ১৯৮৪ সালে তাঁর "লালন-জিজ্ঞাসা" বইতে বলেছেন :

> 'প্রাণান্ত পরিশ্রম' করলেই কি কোনো মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়? লালন শাহ্ জন্মগতভাবে মুসলিম-সন্তান। একথা তিনি স্বীকার না করলেও সত্য।···লালনের জন্মস্থানও যে ভাঁড়ারা নয়, যশোর জেলার হরিশপুরে—সেকথাও সত্য। তার প্রমাণ দুদু শাহের বর্ণনায়, মরহুম আবদুল ওয়ালীর লিখিত প্রবন্ধে ··। এসব তথ্য বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রমাণের জন্য 'প্রাণান্ত পরিশ্রমে'র আবশ্যক নেই।

লুৎফর রহমান উল্লিখিত দুদু শাহ লালনপরবর্তী একজন শক্তিশালী গীতিকার, তাঁর লেখা একখানি কলমি পুঁথি একদা লুৎফর রহমানই মুদ্রণ করেন, যা বাংলাদেশের গরিষ্ঠ পণ্ডিতসমাজ জাল বলে মনে করেন। অন্যদিকে, আবদুল ওয়ালী ছিলেন ইংরাজ আমলের এক সাব-রেজিস্ট্রার। ৩০শে নভেম্বর ১৮৯৮ সালে তিনি বোম্বাইয়ের অ্যানথ্রোপলজিকাল সোসাইটিতে একটি ভাষণ দেন। তার বিষয় ছিল : On Some Curious Tenets and Practices of Certain Class of Fakirs of Bengal। এই প্রবন্ধ পরে সোসাইটির জার্নালে বেরোয় ১৯০০ সালের ৫ম খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যায়।[৮] তাতে লালন এবং তাঁর গুরু সিরাজ সাঁইকে ওয়ালী সাহেব যশোর জেলার হরিশপুরের মানুষ বলে বর্ণনা করে গেছেন কিন্তু লালনকে তিনি 'known as kayastha' বলে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ ওয়ালীর সাক্ষ্যে যাঁরা লালনকে হরিশপুরের মানুষ বলে প্রচার করছেন সেই একই সাক্ষ্য মেনে তাঁকে আর মুসলমান বলা যাচ্ছে না।

হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিসমস্যার গভীরে এখন আমরা যেতে ইচ্ছুক নই এবং পূর্ববঙ্গে লালনকে কেন হঠাৎ মুসলমান প্রতিপন্ন করবার জোয়ার উঠল সে সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করি। তবে ইতিহাসাশ্রিত তথ্যের সাক্ষ্যে আমাদের বলতেই হবে যে লালন ফকির প্রয়াত হয়েছেন ১৮৯০ সালে কিন্তু সেই থেকে দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দুই বাঙলার কোনো গবেষক বা পণ্ডিত লালনকে মুসলমান-বংশোদ্ভূত বলেন নি। মুসলমানের দাবি প্রথম তোলেন পাকিস্তান আমলে অধ্যাপক আবু তালিব। তিনি "লালন পরিচিতি" (১৯৬৮) বইতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন :

> বর্তমান লেখকই সর্বপ্রথমে লালনের সত্যজীবনীর প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথমে লালনকে যশোর জেলার হরিশপুর নিবাসী এবং জন্মগতভাবে মুসলিম সন্তানরূপে দাবী করেন। ১৩৬৩ সালের (=১৯৫৩ ঈসায়ীর আগস্ট) ভাদ্র সংখ্যা 'মাহে নও' পত্রিকায় তিনি সমস্ত প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন—'আনুমানিক ১১৭৩ (১৭৬৬ ইং) সালে যশোহর জিলার অধীন হরিণাকুণ্ডু থানার অন্তর্গত হরিশপুর (কুলবেড়ে হরিশপুর) গ্রামের এক খোনকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লালন শাহ।···'

কিন্তু ইতিহাসের কৌতুক এইখানে যে, লালন নিজে কী জাত ছিলেন তা সযত্নে গোপন রেখে গেছেন। বোধহয় কোনো গভীরতর অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর জাতিতত্ত্বে অনাস্থা এসেছিল। "হিতকরী"-র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

> ইহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান

শুনিলে তাঁকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণবধর্ম্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত।

প্রত্যক্ষদর্শীর এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় লালন নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন এক সুকৌশল আড়াল। তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকাই ছিল তাঁর কাম্য। জীবিতকালেই তাঁর জাত নিয়ে মানুষের সংশয় ও বিতর্ক ছিল। কিন্তু অন্যের জাত নিয়ে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩০২ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালি অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে লালন-বিষয়ে সরেজমিন যা জেনেছিলেন তা লিখে পাঠিয়েছিলেন "ভারতী" পত্রিকায়। তাতে আছে :

> লালনের ধর্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন ও শিষ্যদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতেন। লালন হিন্দুনাম, সা উপাধি মুসলমান জাতীয়—সুতরাং অনেকেই তাঁহাকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিত। তিনি কোন উত্তর না দিয়া স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত গানটি শুনাইতেন—
>
> সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
> লালন ভাবে—জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।

এরপরে গানটির পুরো উদ্‌ধৃতি আছে, তা এত প্রসিদ্ধ যে এখানে পুনরুদ্ধৃত করলাম না। কিন্তু পাঠকদের লক্ষ করতে বলব দুটি বিষয়। প্রথমত, "হিতকরী" ও "ভারতী"-র প্রতিবেদনে (যা যথাক্রমে লালনের প্রয়াণের সদ্য পরে ও পাঁচ বছর পরে লেখা) লেখক দুজন কোথাও লালনকে 'বাউল' বলেন নি বরং তাঁর ধর্মমতকে এক মিশ্র উদার মত বলে জানিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, দেখা যাচ্ছে, তার সাধনজীবনের ধরন দেখে সমসাময়িক অনেকের মনে লালনের জাতিপরিচয় বিষয়ে প্রশ্নাকুল উৎকণ্ঠা জাগত। লক্ষণীয় এটাও যে, তাঁদের প্রশ্ননিরসনে লালনের কোনো আগ্রহ ছিল না। কেননা মানবিক বোধের এমন সমুচ্চ চূড়ায় তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখান থেকে জাতিতত্ত্ব এক নিষ্ফল আচারসর্বস্ব শুষ্ক পরিহাস বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। দেশের মধ্যে অন্তঃশীল ছিল যুক্তিবাদের ধারা। ধর্মাচারের প্রচলবহুল অন্তঃসারশূন্যতা অনেকেই বুঝতে শুরু করেছেন। মীর মশাররফ, কাঙাল হরিনাথ বর্গের সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ভাবনার লেনদেন ছিল, শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটে তিনি যেতেন। যেখানে বোটের উপর বসিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর চেহারার স্কেচ করেছেন তখন ধরে নেওয়াই যায় যে উচ্চতর ধর্মতত্ত্বের কিছু দেওয়া-নেওয়া উভয়ের মধ্যে আগে থেকে ছিল। লালনকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্কেচবুকের একজন অঙ্কনযোগ্য ব্যক্তিত্ব বলেই বিবেচনা করেছিলেন ধরে নিতে হবে।

এসব থেকে বোঝা যায়, লালনের ব্যক্তিত্বে যেমন উদার সমন্বয়বাদ ছিল তেমনই নতুন নিরীক্ষার সাহস ও নির্ভীকতাও ছিল। যদি জন্মগতভাবে তিনি মুসলমান হতেন তবে তা গোপন করার কোনো কারণ ছিল না। বহুকাল থেকেই বাঙলায় শরীয়তবাদী বহু মুসলমান-আচার ত্যাগ করে অনুভববাদী মারফতি ফকির হয়ে আসছেন। তাঁদের কেউ কি জাতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন? তুললেও তাঁরা কি সত্য গোপন করেছেন ভয়ে? করেন নি। তার জন্য মৌলবাদীদের অত্যাচার সয়েছেন। যেমন লালনের সমসাময়িক ভাবসাধক গীতিকার পাগলা কানাইয়ের (১৮০৯-১৮৮৯) মৃত্যু হলে মৌলবীরা জানাজায় যোগ দেন নি। লালন এসব জানতেন। তাই কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁর অন্তিমকার্যের নির্দেশ তিনি দেন নি।

কুষ্টিয়ার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও নিষ্ঠাবান মুসলমান এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দিন তাঁর "বাউল মতবাদ ও ইসলাম" (১৯৬৯) বইতে পরিষ্কারভাবে বলেছেন :

> ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
> হিন্দু কি যবন বলে—
> তার কাছে জাতের বিচার নাই॥

উপরিউক্ত আলোচনায় এ কথা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, লালন জাতিতে বিশ্বাস করিতেন না। ··ছেঁউড়িয়ার যে পল্লীতে তিনি বাসা বাঁধিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই মোমিন সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। তিনি এক মুসলমান মেয়েকে নিকাহ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় তিনি মুসলমান, এ কথা প্রকাশ করিতে তাঁহার ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। তবুও তিনি জাতিত্বের পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। তবে কি লালন তাঁহার জাতিত্বের আসল পরিচয় গোপন করিয়াছেন?

শেষ বাক্যে ইমামউদ্দিনের ইঙ্গিত খুব ব্যঞ্জনাপূর্ণ। তাঁর রায় কি তবে লালনের হিন্দুত্বের দিকে?

লালন তাঁর প্রবাদপ্রতিম গানটির শেষে বলেছিলেন—

> জগৎ বেড়ে জাতের কথা
> লোকে গৌরব করে যথাতথা।
> লালন সেই জাতের ফাতা
> বিকিয়েছে সাত বাজারে॥

এই স্তবকের মর্মবাণী টেনে ইমামউদ্দিন প্রশ্ন তুলেছেন :

> বিশেষ করিয়া তিনি নিজে হাতে যাহা 'সাত বাজারে' বিক্রী করিয়া গিয়াছেন, পৌনে একশত বৎসর পরে তাঁহার বিক্রী করা জিনিস ফিরাইয়া আনিবার এই অপচেষ্টাই বা কেন? লালন জীবিতকালে যে 'জাত'এর গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতে চাহেন নাই, এখন তাঁহাকে 'জাত'এর সীমারেখায় আবদ্ধ করিলে কি তাঁহার উপর অবিচার ও অন্যায় জুলুম করা হইবে না?

এ প্রশ্ন কেবল ইমামউদ্দিনের নয়, আরও অনেকের। কিন্তু এর জবাব কোথায় পাওয়া যাবে? বিশেষ করে এখন বাংলাদেশে লালন-গবেষকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছেন। তাঁদের লেখা বইতে উতর-চাপানের কৌশল দেখবার মতো। তবু তার মধ্যে থেকেই প্রকৃত সত্য নিষ্কাশিত হবে একদিন। কিংবা যুযুধান দুই পক্ষ সময়ান্তরে বুঝবেন লালন ফকিরের জীবনসত্য আর লালনগীতির অন্তর্বাণী গভীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতের সেইসব মরমি মানুষদের জন্য, যাঁরা জাতপাত ও স্থানমাহাত্ম্যের অনেক উর্ধ্বে তাঁকে যথার্থ আসনে বসাবেন। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন লালন ফকির দুই তরঙ্গের উচ্ছ্রিত স্রোতোবেগে অসহায় ভাসমান ফুলের মতো দোলায়িত হবেন। [ক্রমশ

উল্লেখপঞ্জী :

১. 'লালন ফকিরের গান' : মতিলাল দাস। লালন স্মারক-গ্রন্থ। ঢাকা, ১৯৭৪। পৃ ৩৭।

২. 'রৌরব' বহরমপুর এই সংবাদ ঘোষণা করে জানাচ্ছে : লালনের এই পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে রৌরব প্রকাশনী থেকে বার করছেন ড. শক্তিনাথ ঝা। বইটি এখন যন্ত্রস্থ।

৩. লালন শাহ : আবুল আহসান চৌধুরী। বাংলা একাডেমী। ঢাকা। ১৯৯০
বইটি লালন সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্যের আকর। আমার প্রবন্ধের প্রধান তথ্যসূত্র বহু ক্ষেত্রে এই বই।

৪. হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন : 'কাঙাল হরিনাথের অপ্রকাশিত "দিনপঞ্জি"তে দেখি সত্যি সত্যি লালন-চরিত্র—ভোলা বাউল আবার প্রয়োজন হলে হতে পারেন জাঁদরেল লাঠিয়াল। হাতের একতারাটি রেখে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাঠিও ধরতে পারেন। কাঙাল হরিনাথ তাঁর পত্রিকা "গ্রামবার্তা"য় জমিদারের

প্রজানিপীড়নের খবর ছাপানোর জন্য সেই জমিদার যখন কাঙাল হরিনাথকে শায়েস্তা করার জন্য লাঠিয়ালের দল পাঠান, তখন লালন তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে ঢিট্ করে সুহৃদ কৃষক-বন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন। [কাঙাল হরিনাথের দিনপঞ্জি—শ্রীঅরুণ রায়ের সৌজন্যে]। লালনের গান ও জীবনে এখানেই মিল।' (পল্লীসমাজের সংগীত ও সংঘাত)

৫. রবীন্দ্রনাথের নানা পর্যায়ের ভাঙা গানের তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য "গানের লীলার সেই কিনারে" : সুধীর চক্রবর্তী। কলকাতা, ১৩৯২। বইয়ের 'কোন্ ভাঙনের পথে এলে' অধ্যায়।

৬. সম্পূর্ণ আবেদনপত্রের বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য : "কুষ্টিয়ার বাউল সাধক : আবুল আহসান চৌধুরী। ঢাকা, ১৯৭৪। পৃ ১২০-১২২

৭. এ. এইচ. এস. ইমামউদ্দিন তাঁর "বাউল মতবাদ ও ইসলাম" (১৯৬৯) বইতে লিখেছেন : 'কতিপয় লালন-ভক্ত সুধী ব্যক্তির চেষ্টায় বিলুপ্তপ্রায় লালন শাহের আখড়া নবজীবন লাভ করিল, গড়িয়া উঠিল লালন-স্মৃতিসৌধ। আখড়া পরিণত হইল মাজার শরীফে এবং লালন সাহেব উন্নীত হইলেন মহাসুফীসাধক পদে।'

৮. প্রবন্ধটির পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩৪ সালে। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। এখানকার সরকারি কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। সংগীত, শিল্পকলা, লোকধর্ম, গ্রামীণ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুশীলন তাঁকে বিশেষজ্ঞের মর্যাদা দিয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণা পুঁথিগত নয়। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাটে ঘুরে-ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন তথ্য আর অভিজ্ঞতা। তাই তাঁর আলোচ্য বিষয় হয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ এবং গভীরতাসঞ্চারী। এযাবৎ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হল : "সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান", "কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ", "গানের লীলার সেই কিনারে", "বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান", "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ", "আধুনিক বাংলা গান", "গভীর নির্জন পথে", "বাংলা দেহতত্ত্বের গান" ইত্যাদি।

আগুন নিয়ে খেলা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আগুন নিয়ে খেলা আমি করেছিলাম
তোমরা যারা করছ, তাদের বলি :
পুড়তে হলে একবারে নয় অনেকবারে
ছোটো-ছোটো হাঁরে বুকের পাঁজর থেকে উগরে দিয়ে
তারপরে ঐ হা-হা হাওয়ায় আতসবাজির মতো
জ্বলতে-জ্বলতে আঁকো তোমার নিজস্ব আলপনা,
পার কি আর পার না তবে বুঝিয়ে দাও,
একবার যে-আগুন গেছে সেঁদিয়ে, তাকে তুমি
কেরোসিনের জিভে-চাখা কাপড়গুলোর মতো
বহন করো, বহন করো, বহন—
আমি জ্বলেছিলাম বলে হয়তো আলো জ্বেলেছিলাম
তারপরে কী পাঁজর বা হাড় বা রক্ত কিংবা মেধা
কে জানতে চাইছে আর বলো ?
জ্বলো তবে, মরণপণ জ্বলো, মাটি থেকে আকাশ
পুড়িয়ে না দিয়ে তাকে পালটে দাও
ফুলন্ত নকশায়—
আগুন নিয়ে খেলা আমি করেছিলাম
আহা, আগুন নিয়ে খেলা।

তুমি

মতি মুখোপাধ্যায়

তুমি খুব কথা বললে দু চোখ আমার
ভিজে যায় অবিরল বৃষ্টির ধারায়
প্রতিটা জলের বিন্দু অক্ষরের মতো
খুশিমতো সংগমে শব্দ হয়ে ওঠে
একেক শব্দের গূঢ় ইতিহাস থাকে
থাকে তার নিজস্ব ভূগোল
কোনো শব্দে ভালোবাসা চকিত চুম্বনে
সিক্ত করে ওষ্ঠাধর
এমনো শব্দ আছে যার প্রতি তীব্র অনীহায়
বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সরে যাই দুজনে দুদিকে
কোনো শব্দ তুমি ভালোবাস
কোনো শব্দ আমি
সব মিলেমিশে যেতে এখন ভিজছে মনোভূমি।

মেঘের মতোন তুমি চুপ করে থাকলে দেখেছি
বাস্তুহারা হয়ে যাই
সীমান্ত পেরিয়ে যাই আশ্রয়সন্ধানে
উদ্ভিদের মতো বুঝি জন্ম নেব অন্য ভূমিতে
শব্দহীন ফুল ফুটাব পর্বসন্ধিতে
শূন্যতারও তীব্র এক সৌরভ থাকে
উড়ে আসে অলৌকিক সোনালি ডানার প্রজাপতি
স্তব্ধতা হয়তো হিমবাহ
যা থেকে নেমে আসে মৌন নদীরা, যার জলে
স্নান সেরে নিয়ে যেন অপেক্ষায় থাকি
বিচ্ছেদ ভেঙেচুরে কখন আসবে কাছে তুমি
প্লাবনে ভাসিয়ে দেবে আমাদের যৌথ বাসভূমি।

মারুমারের বাংলো ডাকে

সমীরণ মজুমদার

বাওবাব গাছের দেশ দেখে
গোরোংগোরো গিয়ে দেখি
অদৃশ্য কুসুম যেন অসংখ্য গ্যাজেলস
মারুমারের বাংলোয় বসে তোমার কথা
তোমার প্রাণের কথা
মনে পড়ল, লুপ্ত মন্দিরের মতো
মিশে আছে সব ভালোবাসা
অদৃশ্য কুসুমের মতো এক আকাশ নীরবতা
অন্ধকার ও আলোর মাঝে এই যে জীবন
আধুনিক গদ্যেরই মতন যেন—
স্কাইরুমে বসে এইমাত্র ডিনার সেরেছি
ইটার্নালে হনিমুন, তারপর হাজার বছর পরে
ফিরে দেখা ; পুরনো স্মৃতি অনুষঙ্গ হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত,
তবু নতুন দিগন্ত থেকে ভালোবাসা উঁকি দেয়
মারুমারের বাংলো ডাকে, নেতারহাট,
রুদ-এর বাংলো ডাকে আয় আয়
বিজলি আলো নেই, মেঘছেঁড়া রোদ আর
বৃষ্টি-ভেজা রুপোলি রাত্রি অপেক্ষায় থাকে।
স্মৃতি আজ কথা বলে, হাসে, গান গায়,
ঝরাফুল আর ভেজা ঘাস মাড়িয়ে
কেবলই ছোটাছুটি করে একা-দোকা খেলে।

মধ্যবিত্ত

নাসিম-এ-আলম

পাতালের অতলে ছিল এই অন্ধকার।
অশ্রুবিলাসের শব্দ আর কিছু স্বপ্নের ভিতর দেখলাম
তা ছড়িয়ে গেল সমস্ত পৃথিবী জুড়ে।

তখন রাত্রি, কিংবা রাত্রির মতো স্বপ্নময় কিছু…
আকাশকে মনে হল—ভালোবাসার চিঠি কিংবা বিরহের।
সেই প্রথম মরুভূমির কথা ভেবে
আমার ভ্রমণপিপাসা জাগল।
আমার মনে হল অন্ধকার—বিরহ আর অশ্রুর মাঝে
এক নিকট আত্মীয়তা আছে…।

সপ্তাহে একদিন আলোর স্পর্শ পেয়ে
চোখের পাতা জুড়ে থাকল ইডেন, ভিক্টোরিয়া, গঙ্গার তীর,
সিমেনটের পারমিট, রেশনের লাইন, রাজনৈতিক সংবাদ,

কবিতার খাতা হারিয়ে গেছে।
শিল্পকে পরিত্যক্ত বাড়ির মতো মনে হল।

রেলযাত্রীর ডায়রি

অসীম রেজ

শব্দে স্মৃতি আসে, গন্ধে স্মৃতি আসে, স্পর্শে স্মৃতি আসে। আমার সমস্ত অনুভূতি বারবার জানিয়ে দেয় সব যেমন ছিল তেমন আছে। কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। তবু এতগুলো বছর যে পার হয়ে এলাম, এ কি মিথ্যে? আমার শরীরের এই স্খলন, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া, চুলে পাক ধরা, চোখের তীব্রতা কমে আসা—সবই মিথ্যে। মনের বয়স বাড়ে না কখনও। আজও আমি তেমন—যেমন থাকতে চেয়েছি, যেমন ছিলাম অথবা যেমন থাকার ইচ্ছা। গাড়িটা যাচ্ছিল আর মনের ভিতর এই কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল বারবার। এর মধ্যে কটা স্টেশন পার হল মনে নেই। আমার গন্তব্যস্থল আর কত দূর, সময় ঠিক কতটা লাগবে জানি না। আমার পাশে যে মানুষটা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল তাকে তুলেও জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। অনেক রাত্রে এই লোকটা আমারই মতো মাঝপথ থেকে ট্রেনে উঠেছে। বাঙ্কের একেবারে নীচের বার্থটা আমার। এই কুপটায় তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। লোকটা উপরের বার্থটায় আশ্চর্য নির্ভাবনায় ঘুমোচ্ছে। যেন বহুদিন ঘুমোয় নি। মাঝরাতে কোন্ স্টেশন থেকে কখন যে উঠল কে জানে। এমন এক-একটা লোককে দেখেছি এইভাবে গাড়িতে উঠেই গায়ে চাদর টেনে অনায়াসে ঘুমিয়ে যেতে পারে। অথচ আমি পারি না। সারা-রাত প্রায় জেগে থাকি। এ কমপার্টমেনটায় আলো নেই, পাখা চলে না। মাঝে-মধ্যে হুমদাম আওয়াজ, লোক উঠে পড়ে। অ্যাটেনড্যানট মাঝপথেই নেমে পড়ছে। ইনজিনের শব্দ, পাথরের শব্দ, ঘর্ষণের শব্দ আর মাঝে-মধ্যে হুইশল বেজে উঠছে। যত রাত বাড়ে গাড়িটা তত স্পীড নেয়। স্পীডে গাড়িটা দুলতে থাকে। সারারাত এমন বিচিত্র আওয়াজে আর দোলানিতে আমার ঘুম আসে না। শুধু তন্দ্রার মধ্যে জেগে থাকি।

আজকাল ট্রেনই আমার ঘর হয়ে উঠেছে। এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে, সারা

ভারতবর্ষ প্রায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই ভালোমন্দ বিচার করার মতো সময় আমার নেই। এক-একটা ট্রেন এক-এক রকম। কোনোটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে; কোনোটা নোংরা, কাদা, দুর্গন্ধময় বস্তির মতো। কোথাও মানুষে ঠাসা, কোথাও ফাঁকা; কখনো এমনই ফাঁকা যে কোনো যাত্রী না থাকলে ভয় হয়। যেমন পাশের লোকটা না এলে হয়তো আমায় এই কুপটা পালটাতে হত। পরপর কয়েকদিন কয়েকটা যাত্রীবাহী ট্রেনে বোমা-বিস্ফোরণ হওয়ায় লোকে এখন ভয়ে বার হচ্ছে না। ট্রেনে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। আমি যেতে বাধ্য। কারণ আমার এই যাত্রার সঙ্গে আমার রুজি-রোজগার জড়িয়ে আছে। একদিনে বেশ কয়েকটা টাকা আমার হাতে আসে। আমার কাজ মাল ফিরি করা। মালের অর্ডার নেওয়া আর তার সাপ্লাই দেওয়া। গন্তব্যস্থলে মাল ঠিক-মতো পৌঁছল কিনা তার তদারকি করা। ভদ্রভাষায় আমি একজন কোম্পানির 'রিপ্রেজেনটেটিভ'। 'রিপ্রেজেনটেটিভ' কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো সবার মনে একটা বিশেষ চেহারার মানুষ ভেসে ওঠে। আমরা একটা শ্রেণী। নিজেদের ভিতরই আমরা সবসময় গণ্ডিবদ্ধ থাকি। আমাদের কথাবার্তা, বেশভূষা, আচার-ব্যবহারে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হয় যে সব সময় আমরা তৈরি; যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে আমরা প্রস্তুত আছি। আসলে আমরা কেউ কারো থেকে আলাদা নই; একটাই আইডেনটিটি আমাদের। আমি সীতেশ প্রতীপ কিংবা অমল—প্রত্যেকেই একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে। আমাদের মাল বিক্রি করতে হবে, মালের বাজার তৈরি করতে হবে, একটা নির্দিষ্ট টার্গেট। তবে আমরা মোট বই না। মোটের বদলে হাতে থাকে একটা সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগের ভিতর অফিসের কাগজপত্র, ডায়রি, ফ্রী গিফট, কমপ্লিমেনটারি আর থাকে মানুষের দৈনন্দিন চালিয়ে নেবার মতো জিনিসপত্র। এগুলো বরাবরের জন্যে গোছানো থাকে। তাই ব্যাগটাই আমাদের একমাত্র সম্বল, আমাদের জীবন। আমার জীবনের প্রায় বিশটা বছর এইভাবে কেটে গেল। লোকের সঙ্গে পরিচয় ও ভিজিটিং কার্ড জমতে-জমতে প্রায় হাজার খানেক হয়ে গেছে। এখন আর লোকগুলোকে সঠিক মনে করতে পারি না। মনে করা অসম্ভব। যখন বয়স অল্প ছিল তখন মনটা কম্প্যুটরের মতো কাজ করত। এখন করে না। আমিও মনে রাখার চেষ্টা করি না। এটা অযথা মনকে ভারাক্রান্ত করা বলে বোধ হয়। তবু কোনো একটা মুখ, একটা ব্যক্তিকে পছন্দ হলে তার কথা মনে পড়ে। তার সঙ্গে অথবা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোথাও মিল থেকে থাকে। নইলে পছন্দরই বা কী আছে? এই মুহূর্তে আমি এমনই দু-একজনের কথা মনে করতে পারি। সেদিনের সেই ভদ্রলোক, তরতরে জোয়ান ছেলেটা বা ছোট্ট মেয়েটা পা দুলিয়ে-দুলিয়ে কেমন আধো গলায় গান গাইছিল। তবে এদের নাম মেলাতে পারি না, নাম ভুলে যাই। কয়েকটা বিশেষ চেহারার মানুষ নেগেটিভ ফোটোগ্রাফের মতো আবছা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মুখটা সঠিক মনে পড়ে না।

প্রথম-প্রথম চাকরিতে জয়েন করার পর ট্রেনে চড়ামাত্রই খুব খারাপ লাগত। বাড়ির কথা খুব মনে পড়ত। আমার নিজের মানুষগুলোর কথা, আসবাব-পত্র, টুকিটাকি অজস্র জিনিস, আমার ঘর, জানালা, দরজা, বারান্দা জুড়ে অতিযত্নে সাজানো ক্যাকটাসের চারা, জানলার পাশে মাধবীলতা আর সব মিলিয়ে আমার আশৈশব স্মৃতি। সেগুলোর কথা ভেবে ভয়ানক কষ্ট পেতাম। ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে এইসব ভাবতাম। আসার আগের দিন মা অনেকরাত অবধি জেগে থাবার বানাত। আমার স্ত্রী আমার ব্যাগ গুছিয়ে দিত; জল, চটি, রুমাল, চিরুনি পর্যন্ত সব বেছে-বেছে দিয়ে দিত। আমার ছোটো ভাই ভোর-রাত্রে ট্যাক্সি ধরে দিত। পৌঁছোনোর সংবাদ দেবার

জন্যে পোস্টকার্ডে ঠিকানা পর্যন্ত লেখা থাকত। আস্তে-আস্তে সময়ের সাথে সব ধুয়েমুছে গেছে। আমি যাই আর আসি, বছরের পর বছর, দিনের পর দিন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াই। এখন বাইরেটাই আমার ঘর আর ঘরটা যেন একটা সরাইখানা। তাই বেরোনোর আগে এখন আর কাউকে বিরক্ত করি না। নিজের যাবার আগে টুক-টাক গুছিয়ে নিয়ে ভোররাত্রে রওনা হই নিঃশব্দে যাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

মাসে বড়ো জোর তিন-চার দিন বাড়িতে থাকা। আস্তে-আস্তে সব সয়ে গেছে। বিয়ের পর প্রথম-প্রথম খুব খারাপ লাগত। মনে হত অন্যের বাড়ির মেয়ে এনে তাকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু সব অভ্যেস পালটে গেছে। কষ্টের বোধগুলো চাপা পড়ে গেছে পাথরের নীচে। ছেলে-মেয়ে হবার পর থেকে আমার স্ত্রীর সমস্ত ভালোবাসা ছড়িয়ে গেছে সন্তানদের ভিতর টুকরো-টুকরো। আমার স্মৃতি জাগিয়ে রাখার জন্যে সে আমার সমস্ত জিনিস তাসের মতো একবার ভাঙে আবার গড়ে; একবার ফেলে আবার গোছায়; উলটেপালটে এদিক ওদিক করে। তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এ যেন এক মজার খেলা। আর এইভাবে সে আমাকে জীবন্ত রাখতে চায় চার দেওয়ালের ভিতর। আয়নাটা পুব থেকে পশ্চিমে যায়, চেয়ারটা ঘরের মাঝ থেকে দেওয়ালের আড়াআড়ি, ঘড়িটা টেবিলের উপর থেকে ড্রেসিং টেবিলে, ফোটোগ্রাফ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ালে আর আমার প্রিয় বইগুলো মিলিয়ে-মিশিয়ে এমন এক স্মৃতি তৈরি করে যা তার প্রতিটি মুহূর্তকে কেড়ে নেয়। সে ভাবনায় ডুবে যায় আমার কাছাকাছি। আমি যতবারই ঘরে ফিরি ততবারই নতুন-নতুন সাজানো দেখি, নতুন জীবন টের পাই। ফোটোফ্রেমে আমাদের বিবাহের রঙিন ছবি ফ্রীজের মাথায় শোভা পায়।

ভোর হয়ে আসছে। কাচের পাল্লাটা খুলে দিতেই একঝলক রোদ পাখির ডানার মতো ঝাপটাতে-ঝাপটাতে আছড়ে পড়ল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি সবকিছু দ্রুত সরে যাচ্ছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য, অবিকৃত, নিখুঁত—যেন বছরার বহু জায়গায় একই রকম দেখা। কোনোটার থেকে কোনোটাকে আলাদা করা যাবে না। পরিবর্তন বলতে শুধু মাটির রঙ পালটায়। কোথাও সমতল, কোথাও ঢিলার পর ঢিলা, উঁচু-নীচু, জল আর জঙ্গল। কোথাও ধু-ধু করছে রুক্ষতা, কোথাও ছোটো-ছোটো জলাশয়, ঝরনা, বুনোফুল, মহুয়ার গন্ধ, জঙ্গল বেঁধে আদিবাসী মেয়েরা ঘরে ফেরে। ভ্রমণবিলাসীরা এর স্বাদ নেন। এইসব কবিদের প্রেরণা যোগায়। আর আমার মতো ভ্রাম্যমাণ এক ফেরিওয়ালার জীবনে সবই মিথ্যে, মেকি, অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সমস্ত ভারতবর্ষের ম্যাপটা যেন চোখের সামনে একটা সাদা জমির উপর অসংখ্য আঁকিবুঁকিকাটা রঙিন দাগের মতো এলোমেলো, অসংগতিপূর্ণ মনে হয়। অচেনা, অজানা স্টেশনগুলো একে-একে পার হয়। আজকাল এদের পরিচয় জানার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হয় না। দেখি চকিতে সরে-সরে যায় সবুজ সারি-সারি কাঠের বেঞ্চ, বর্শার ফলকের মতো লোহার রেলিং আর হলুদ বোর্ডের উপর কালো-কালো অক্ষরে লেখা বিচিত্র সব নাম। প্রথম-প্রথম এই নামগুলো আমাকে খুব আকর্ষণ করত। এখন আর করে না। সেই নামটাই কেবল মনে রাখার চেষ্টা করি যেখানে আমায় নামতে হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে আমার ঘর বাড়তে থাকে। আসলে ট্রেনের এই বগি, এই কুপটায় আমার ঘর হয়ে উঠেছে। প্রথম-প্রথম ট্রেনে চলাফেরা করতে আমার অস্বস্তি হত। এখন আর হয় না। খুব সহজেই এটাকে ঘরের মতো ব্যবহার করতে পারি। খেতে, শুতে, পড়তে কোনো অসুবিধাই হয় না। কতকগুলো বাঁধা অভ্যাসের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। যাত্রী থাকলে দিনের বেলায় বেশ কেটে যায়—পরিচয়ের সূত্র ধরে, তাস খেলে, গল্পগুজব করে।

মাঝে-মধ্যে হঠাৎ স্টেশনে নেমে পড়ি। তখন ওই স্টেশনকে বাড়ির বারান্দা বা খোলা ছাদের মতো মনে হয়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দূরের শোভা দেখি। প্রকৃতির অপার বিস্ময় চোখের সামনে খেলা করে। স্পষ্টত কোনো মানুষ তখন চোখে পড়ে না।

রোদটা ফিকে হলুদের মতো হয়ে এসেছে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। শার্সিটা বন্ধ করে আমি জানলায় মুখ রেখে সকালের শোভা দেখি। লোকটা এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গতকাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হওয়ায় সব ধুয়েমুছে বাইরেটা কাচের মতো স্বচ্ছ ঝকঝকে দেখাচ্ছে। সবুজ গাছগুলো যেন আরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ি, লোকজনকে খেলনার মতো মনে হয়। যেন এদের কোনো ওজন নেই, হালকা বিশাল এক জমির উপর যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে। একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় সব বুঝি ভেঙে চুরে, দুমড়ে মুচড়ে যাবে। এদের নানান নকশা মিলেমিশে কয়েকটা জ্যামিতিক আকারে ফুটে উঠেছে। আকাশ, মাটি, গাছপালার বিচিত্র রঙের ঢেউয়ে এদের রঙ বড়ো বেশি মলিন, নিষ্প্রভ বোধ হয়।

চলন্ত ট্রেনের সাথে শব্দ গুমরে-গুমরে উঠছে হাওয়ায়। হাওয়ার গতির সাথেই শব্দ বাড়ে বা কমে। পাহাড়ের গায়ে, অরণ্যের ভিতর, ব্রীজের উপর, টানেলের অভ্যন্তরে ওই শব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে। ফাঁকা জমির উপর, ধূ-ধূ বালি ও জলের উপর ওই শব্দের বিচিত্র ধ্বনি ঝরে পড়ে কুয়াশার সাথে। আর মাঝে-মাঝে কানফাটা কর্কশ হুইশলের চিৎকার সমস্ত নীরবতা ভেঙে আমাকে বার করে আনে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত থেকে।

আমি আকাশ দেখি, পাহাড় দেখি, নদী দেখি। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের উপর ফিকে নীল হলুদের ছায়া। আলো পড়ে জলের উপর। টিলার উপর কয়েক শতাব্দীর গাঢ় মেটে রঙ জমে থাকে। অজস্র ছোটোবড়ো পাথরের গায়ে বিচিত্র রঙের নকশা। আলো খেলে ফুলে, লতায় পাতায়, পাখিদের ডানায়। আমি আনমনে জানলায় মুখ রেখে সব দেখি, তখন শৈশবস্মৃতির কথা মনে পড়ে। রঙের বাক্স হাতে জানলার ধারে বসে ভাবি—কী রঙ লাগাব আকাশের গায়ে।

এক-একটা জায়গা আসে আর মনে হয় যেন আর-একবার এসেছিলাম এই জায়গাটায়, খুব পরিচিত মনে হয়। স্বচক্ষে দেখা, ছবিতে নাকি স্বপ্নে এর ছবি আঁকা হয়ে আছে। ডুরাং পাহাড় থেকে নির্জনতায় ঢাকা ঝক্কারপুর। গমের খেত, কমলালেবুর বাগান, পানের বরজ, জলপাই থেকে শুরু করে রবারের বন; পদ্মপাতায় জল টলটল করে, মুক্তোর চাষ হয় জলের ভিতর। কোথাও শুধু টিলার নীচে অনাবিষ্কৃত পৃথিবী ঘুমিয়ে থাকে। কোথাও শ্বেতপাথরের স্তম্ভ মানুষের বিজয়গর্বের সাক্ষ্য বহন করে।

ইনজিন চলেছে মাটি কাঁপিয়ে ঝড়ের গতিতে। নদী চলে, মাঠ চলে, গাছপালা ঘরবাড়ি, মানুষের আস্তানা একে-একে পার হয় নিমেষের ভিতর। কোথাও স্থির থাকে না কিছুই। দ্রুতগতি সামনের পথ ক্রমশ বাড়তে থাকে। অনন্ত সময় জুড়ে থাকে অখণ্ড নীরবতা।

ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি এখন রাত দশটা। পাশের লোকটা কখন নেমে গেছে কে জানে। কুপটা একেবারেই ফাঁকা। বগিটা নির্জন। একবার উঠে গিয়ে অ্যাটেনড্যানটকে সজাগ করে দিয়ে আসি। দরজাটা ভিতর থেকে ভালোভাবে লক করে দিই। কয়েকজন পুরুষ, দু-একজন বৃদ্ধা, মহিলা আর শিশু ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে। ট্রেনে সাধারণত আমার ঘুম আসে না। জল খাই, সিগারেট ধরাই, চশমাটা খুলে রাখি, বই পড়ার চেষ্টা করি। স্বল্প আলোয় প্রায় কিছুই দেখা যায় না। জানালায় পাশ দিয়ে হঠাৎ ঝড়ের গতিতে একটা ট্রেন চলে গেল। স্লাইডের মতো কয়েক টুকরো আলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

ছোটোবেলা থেকেই আমার রেলগাড়িতে চড়ার শখ। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে মার্টিন রেল চলত। এক বিস্তীর্ণ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছোটো রেলটা কোথায় যে যেত কে জানে। বাবা বলতেন, 'চণ্ডীতলায় মেলা বসুক, তোদের নিয়ে যাব।' সেই থেকে ট্রেনে চড়ে মেলা দেখার শখ থেকেই গেছে। রাতের এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তটা কাটিয়ে তোলার জন্যে আমি রেডিওটা খুলি। বিচিত্র শব্দের ঢেউয়ে কোনো কিছুই স্পষ্ট শোনা যায় না। আবার কখনও-কখনও একটু সজাগ হয়ে জানালায় কান পাতলে যেন বাতাসে বাজনার সুর ভেসে আসে মনে হয়—কেউ বেহালা, সানাই অথবা সেতার বাজায়। খুব পরিচিত বাজনার সুর মৃদুস্বরে মনের ভিতর গুনগুন করে। নীরবে আমিও সেই সুর ভাঁজতে থাকি।

একাকিত্বের এই উপলব্ধিটা আজকাল যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সমস্ত কিছুর ভিতর থেকেই যেন আমি কেমন নেই। কোনোদিনই কি ছিলাম কোনো কিছুর সঙ্গে? সমস্ত বস্তুগুলোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভয়ানক এলোমেলো, ছাড়া-ছাড়া। সমস্ত অতীতটা বড়ো অস্পষ্ট, অলীক স্বপ্ন মাত্র। এই মুহূর্তে এই বগিটার ভিতর আমি থেকেও যেন নেই। এই বাক্স-গুলো, লোহার শিকল, কালো-কালো অক্ষর লেখা নানান নির্দেশনামা, নীল আলো, এই বগিটা অথবা বগির মানুষগুলোর সঙ্গে আমার নির্দিষ্ট কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাই না। শুধু মাঝে-মাঝে শরীর দুলে-দুলে উঠলে আমি টের পাই আমি কোথাও যাচ্ছি। বাইরে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। গাড়িটা একটা অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে চলেছে। আজকাল যখন বাড়ি ফিরি তখন বাড়িটাকে একটা টানেলের মতো, ঘরগুলোকে এক-একটা রেলের বগি বলে মনে হয়। ঘরের লোকগুলোকে রেলযাত্রীর মতো অচেনা, অপরিচিত লাগে। তাদের চালচলন, কথাবার্তা, ভাষা যেন কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারি না। ঘরের জানলা খুললেই দেখি, একটা বিশাল প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্মের উপর সাজানো সবকিছু খেলনার মতো। আমি অবাক বিস্ময়ে বারবার দেখি। যতবার দেখি ততবারই নতুন বোধ হয়।

দৃশ্যত স্মৃতিতে আজকাল কিছুই ধরা থাকে না। একটা ছবি এসে আর-একটাকে মুছে দেয়। একটা নেগেটিভের উপর অজস্র এক্সপোজার হতে থাকে। তবে যে দৃশ্যটা এখনও আমার মন থেকে মুছতে পারি নি, তা হল বাবার মৃত্যু। একটা মানুষের নিঃশব্দে চোখের সামনে দিয়ে অতর্কিতে চলে যাওয়া ও এক গভীর শোকের মুহূর্ত যেন জমাট হয়ে রয়েছে ঘরের কোণে অন্ধকারের মতো। সেই অন্ধকারের ভিতর প্রদীপের মতো জ্বলছে আমাদের সবার দুঃখ আজও। অতীতের নানান ঘটনা মনে পড়ে। তিনি থাকেন সেইসব ঘটনার কোথাও না কোথাও কোনো সূত্রে স্থির চিত্রের মতো। আমরা কোনো পরিবর্তন টের পাই না। সর্বদা তিনি থাকেন আমাদের নানান সুখ-দুঃখের মুহূর্ত জুড়ে। রেলের বগির একেবারে শেষ কোণে যেন বাবারই প্রতিচ্ছায়ার মতো কেউ বসে। কালো কোট গায়ে ফ্যাকাশে আলোর নীচে। তিনি বড়ো একা, বড়ো নিঃস্ব. গমগম-গমগম করতে-করতে গাড়িটা চলে গেল একটা বিশাল সেতুর উপর দিয়ে। গঙ্গা, শোণ অথবা আত্রেয়ী। আজ পূর্ণিমা। ঝকঝকে আকাশ, আলোয় আলোকময়। ভেলভেটের গায়ে তারারা চুমকির মতো জ্বলে। রুপালি চাঁদ যেন উঠে এসেছে থালার মতো পাতাল থেকে।

পকেট থেকে এনগেজমেনট ডায়রিটা খুলে দেখতে থাকি কোথায় কোথায় যেতে হবে, কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে। একেবারেই নতুন জায়গা এটা। কাউকে চিনি না। আমাদের কোম্পানির একটা নতুন শাখা অফিস খুলেছে এখানে। ওরাই সব ব্যবস্থা করবে আমার জন্যে। পূর্বভারতে আমাদের কোম্পানির ওষুধের বিক্রি যাচ্ছে কমে। প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না অন্যের সাথে। তাই বেড়েছে দৌড়ঝাপ, সংশয়, অশান্তি। অতিব্যস্ততার মধ্যে মরবারও সময় নেই কারো।

টার্গেট বাড়াতে হবে। এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে আমাদের।

মধ্যরাতে গাড়ি ভয়ংকর স্পীড নিয়েছে। সমস্ত বগিটা ঝাঁকুনিতে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। এই মুহূর্তে গাড়িটা একচুল এদিক-ওদিক হলেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—এমন এক অজানিত ভয় যেন চেপে বসছে মনের ভিতর। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভয় আর হাওয়ার শব্দে ঘুম চলে যায়। সময়মতো কাল ভোরেই পৌঁছোতে হবে গন্তব্যস্থলে।

এই শীতের সকালে নামাটা যে কত কষ্টের সেটা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে। শরীরটাকে বাঁচাবার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া। তবু এই ঠাণ্ডায় হাত-পা নাড়াতে কেমন যেন আড়ষ্টতা লাগে। দু দিন আগের খাবারগুলো প্রায় শুকিয়ে গেছে। পিঁপড়ে খাচ্ছে রুটির টুকরো, কেক ও মাখনটা। এক টুকরো আপেল কেটে মুখের মধ্যে পুরি। ভয়ানক বিস্বাদ লাগে। জ্বর-জ্বর মনে হয়। মাফলারটা গলার উপর জড়িয়ে নিই।

মাফলারটা গত বছর হাতে বুনেছে আমার স্ত্রী। হলুদ রঙের ভিতর একটা নীল ফুল ফুটেছে। নীল রঙ আমার প্রিয়। এটা বেশি ব্যবহার করি না যদি নষ্ট হয় এই ভেবে। এইভাবে ভালোবাসার টুকরো-টুকরো জিনিসগুলো আমি গচ্ছিত রাখি। অজস্র চিঠিপত্র, কার্ড কিংবা ডায়রি আমার জন্মদিনে মেয়ের তৈরি একটা রঙবেরঙের কাগজের ফুল, ছেলের পাঠানো রঙিন পোস্টকার্ড, বন্ধুর দেওয়া একটা কলম, নদী ও জঙ্গলের মাঝে তোলা পরিবারের কয়েকটা রঙিন ছবি ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে। বাবা চলে গেছেন বহুদিন আগে; অসুস্থ মা জানলায় মুখ রেখে ভাবেন কখন তার ছেলেরা ফিরে আসবে; আমার স্ত্রী জড়ো করে রাখে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির বাক্স; পুরোনো পিয়ানো বেজে উঠে হাওয়ায়; ফোটোফ্রেমে স্থির আমার কৈশোরের ছবি। চোখের সামনে দৃশ্যের মতো সব সাজানো থাকে একে-একে।

ট্রেনটা ধীরে-ধীরে একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই স্বপ্নটা ভেঙে গেল। বাইরে থেকে কেউ প্রচণ্ড আওয়াজ করতে লাগল দরজা খুলে দেবার জন্যে। স্টেশনে লোডশেডিং। চারদিক অন্ধকার। শুধু অন্ধকারের ভিতর ল্যাম্পের মৃদু আলো চোখের মতো সরে-সরে যায়। হকারদের ব্যস্ত চলাফেরা, খাবারের গন্ধ আর ঠুংঠাং শব্দে টের পাওয়া যায় স্টেশনটা বেশ বড়ো আর নির্জন। চোখের নিমেষে দেখি কোত্থেকে এক-দঙ্গল রেল পুলিশ কম্পার্টমেনটে উঠে এসে প্রায় আমার কোল ঘেঁষে বসল।

এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তাদের উপস্থিতি কিছুটা বিরক্তিকর মনে হলেও নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। এরা সীটে হাতপা ছড়িয়ে বেশ আরামের ভঙ্গিতে বসে নিজেদের ভিতর গল্প-গুজব শুরু করে দিল। এদের ভাষা আমি ঘুণাক্ষরে বুঝি না। শুধু হাতপা নাড়া আর অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝতে পারি এরা বেশ উত্তেজিত। আমি আধজাগা অবস্থায় ঝিমোতে থাকি। ঘণ্টা বাজলে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করে। সময় কীভাবে কেটে যাচ্ছে নিজেও জানি না। ট্রেনে যেন চলেছিই তো চলেছি।

ধীরে-ধীরে আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। কুয়াশায় ঢাকা চারধার। স্পষ্ট কিছুই পড়ে না চোখে। শুধু লম্বা-লম্বা ঘাস ছেয়ে আছে। দুদিক জুড়ে। বুনো সোঁদো মাটির গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ার সাথে। কাল রাতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। জনহীন প্রান্তরের ভিতর দিয়ে অতিদ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। মাঝে-মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে লম্বা-লম্বা বাহারি পাতা, ছোটো-ছোটো রঙিন ফুল, উঁচু-উঁচু কাঠের পোস্টের মাথা দিয়ে চলে যায় টেলিগ্রাফের তার; তারের মাথায় দোল খায় ময়না কিংবা টিয়া, কোনো পাখি শিশ দেয় ভোরবেলা।

ভোরে গাড়িটা ক্রমশ এগোতে থাকে এক নতুন শহরের দিকে। বড়ো-বড়ো সরকারি আবাসন, খেলার মাঠ, স্কুল, পার্ক বড়ো-বড়ো হোর্ডিং জুড়ে সোজা

রাস্তা এগিয়ে চলে। সময়মতো আমার গন্তব্যস্থল এটা। দেখতে না দেখতে গাড়িটা এসে দাঁড়াল এক ঘুমন্ত, নিঝুম প্ল্যাটফর্মে। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি কালো জ্যাকেট পরা, মাথায় নীল টুপি ও গলায় লাল মাফলার জড়ানো এক অল্পবয়সী যুবক কাছে এসে দাঁড়াল। আমার বুঝতে দেরি হল না যে এই সেই যুবক যাকে পাঠানো হয়েছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে আমার কাঁধের ব্যাগ ও ব্রীফকেসটা হাতে তুলে নিল। এগিয়ে চলল সামনের দিকে। আমি তাকে পিছনে-পিছনে অনুসরণ করতে লাগলাম। কুয়াশায় ঢাকা চারধার; কিছুই চোখে পড়ে না একেবারে। স্টেশনের বাইরে দেখি একটা ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। তার কথামতো উঠে বসতেই গাড়িটা ছুটতে শুরু করল দ্রুতগতিতে। ছেলেটি গাড়ির চালককে কী যেন বলল। তাদের ভাষা আমার জানা নেই। শুধু বুঝলাম আমাদের খুব দ্রুত যেতে হবে। শরীরটা মাঝে-মাঝে দুলে-দুলে উঠছে যেন ট্রেনের একটা বগি ছেড়ে আর-একটাতে উঠে বসেছি। মনে হতে লাগল সামনের যাওয়ার রাস্তা যেন হাজার মাইল ছাড়িয়ে চলেছে লক্ষ-লক্ষ মাইল। এর বুঝি কোনো শেষ নেই।

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা

অরুণা হালদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দুধর্ম-পরিগ্রহণ—(ঘ)

সংহতি ও সমন্বয়

দক্ষিণভারতের থেকে পাওয়া আর-একটি জিনিস হিন্দুধর্মের বড়ো প্রাপ্তি মনে করি। ভক্তিবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদ দর্শনটিও বস্তুত দক্ষিণভারতের অবদান, এবং পরে তা সর্বভারতীয় হয়। ভক্তিবাদ একপ্রকার ডুয়ালিজম বা দ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদটি হল অ্যাবস-ট্রাকট মনিজম। আচার্য শঙ্কর (দশম খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর মূল প্রবক্তা। ঠিক ধরা যায় না এ চিন্তাভাবনার কী উৎস। সুপ্রাচীন কালের গনডোয়ানাল্যানডের আর আফ্রিকার মধ্যে নৌকাযোগে জনসংযোগ থাকা সম্ভব ছিল। অদ্বয়বাদের মূল এসেছে আফ্রিকার মানাইজম থেকে, এও হতে পারে। অপরদিকে সাতবাহন রাজা-দের সময় এবং পল্লব রাজগণের সময় ঈরানীয় পহ্লবী রাজবংশের সঙ্গে অন্তত দক্ষিণভারতের সম্পর্ক ছিল। অজন্তার চিত্রেও সে পরিচয় ব্যক্ত আছে। মনে হয়, বহুদর্শী সুফীসন্ত অন অল হক এর প্রবক্তা—তিনি অদ্বৈতবাদ-প্রভাবিত ছিলেন। মহামতি আলবিরুনির আল্লাহ শব্দের অনুবাদে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহারের কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু ওইসব তথ্য থেকে আমরা কোনো সিদ্ধান্তই করতে পারি না। এইভাবে হিন্দুধর্ম তার প্রায় ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে একটা নিউক্লিয়াস পেয়েছে। হিন্দুধর্মপর্ব আর সংস্কৃতিভাবনার সম্পর্কিত এই আলোচনার ধারায় কোনো মূলস্রোত না পেলেও অনেকগুলো স্রোতোমুখ এসে একত্র হয়েছে। এই মিশ্রণে সবটা যে মিলিত ঐকান্বিকতা প্রাপ্ত হয়েছে, তা নয়। তবে সেই মিশ্রণকে একটা সমন্বিত রূপে দেখার প্রয়াস করা হয়েছে। এই সমন্বয়সাধনে সতত একটা প্রয়াস বিদ্যমান থাকলেও তা যে সত্যই একটা রূপ নিয়ে সুগঠিত ধর্মের কোনো বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, তা কিন্তু সত্য নয়। স্ববিরোধ, যুক্তি আর আবেগ, ভক্তি আর অন্ধ হিংস্রতা—সবই একসঙ্গে টিকে আছে। উদারতার সঙ্গে আছে অসহিষ্ণুতা। পূর্বাপর আলোচনার ধারা দেখলে আমাদের মনে হয়—ভারতীয় জনজীবনে এক অদ্ভুত এবং অসম্ভব জেনেটি-ক্যাল সংমিশ্রণ হয়েছে। সেটাও এই হিন্দুধর্মের একত্রীকৃত উপাদানসমূহের একই সঙ্গে এক এবং অনেক, বিশিষ্ট আর সাধারণ চরিত্রের বড়ো কারণ। সেইজন্য হিন্দুধর্মকে একটা ধর্ম বলার চেয়ে একটা ভাবনা, একটা চর্যা বা সংস্কৃতিও বলা যায়। হিন্দু-ধর্মকে নানাভাবে দেখা যায়—বিশ্লেষণ করা যায়। এর কোনো একটা দিককে আশ্রয় করা যায়—সব-শুদ্ধ মিলিয়ে সেটাকে হিন্দু অ্যাটিচিউড বলা সঙ্গত। অবশ্যই আমার এ ধারণা বিবাদাস্পদ মনে হবে। কিন্তু এটাও স্বীকার্য যে বিগত তিন হাজার বৎসরের পরম্পরাধৃত নানা জন, নানা জাতি, নানা সংস্কার এবং এক ধরনের সহিষ্ণুতা, গ্রহীষ্ণুতা হিন্দুধর্মকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ আধুনিক কাল পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে।

হিন্দুধর্মের এ সহিষ্ণুতা এসেছে সম্ভবত অষ্ট্রিক জাতির নমনীয়তা বা ফ্লেকসিবিলিটি থেকে। তার গ্রহীষ্ণুতা অনিবার্য প্রয়োজনে এসেছে তথাকথিত ইন্দো-আর্য বলিষ্ঠতার থেকে, তার বাস্তবে গৃহীত ও ফলিত ব্যবহার এসেছে প্রত্নদ্রবিড় আর দ্রবিড় চরিত্র থেকে। ইন্দো-আর্য নৃকুল একই সঙ্গে ইন্দো-ঈরানীয় আর্যকুল, এবং আরো প্রাচীনতর স্লাভ তথা হিট্টাইট নৃকুলের সঙ্গে সুদীর্ঘ অতীতের ভাবনার পরম্পরা-সমৃদ্ধ। অপর দিকে, পূর্ব-মধ্য এশিয়ার শগডিয়ানা বা শকস্থানের সঙ্গে তার যোগ রয়ে গিয়েছিল ; যোগ ছিল আলেকজানডারের আক্রমণের পর থেকে ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের সঙ্গে ও তদ্ভব সংস্কৃতির সঙ্গে। মধ্য-এশীয় কুষাণ ইউএচিদের রাজত্বের (কনিষ্কযেমন) সে সাক্ষী। সম্রাট অশোকের রাজানুকূল্যে বৌদ্ধধর্মের আলো হাতে নিয়ে সে মধ্য এশিয়া পার হয়ে তিব্বত চীন পর্যন্ত গিয়েছে। আবারও গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ-দিকে হুন-তাতারদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পাল-যুগের শেষাবধি বৌদ্ধমতের তন্ত্রাভিলিপ্ত রূপ এবং চীনা তন্ত্রসাধকদের সে এদেশে গ্রহণ করেছে। আর সর্বশেষে বলা দরকার যে, এই সুদীর্ঘ সময় ধরে এক ধরনের ভ্রাম্যমাণ, তীর্থিক বা ফ্রি থিঙ্কার মানুষেরা দলবদ্ধ হয়ে স্বদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং তারও বাইরে নানা দেশে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই পরিব্রাজকগণ সহ সার্থবাহ-দলও পসরা নিয়ে প্রাচীন সিল্ক রুট ধরে বিদেশে ঘুরেছে। রাজাগৃহপুরেও এসেছে বিবাহকেন্দ্রিক নূতন সম্পর্ক। এই-সমস্ত পট-ভূমিতে পরিব্যাপ্ত যে ভাবনা সংস্কৃতি, তারই নাম আজকের হিন্দুধর্ম। এই গতির সচলতা সতত অব্যাহত আছে।

যেমন হুন-তাতার আক্রমণ এসেছে, তেমনই তারা অনেকাংশে এদেশের মাটিতে স্ব-স্ব পথ এবং মত নিয়ে রয়েও গিয়েছে। তারও পরে আনুমানিক অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে একদিকে বৌদ্ধধর্ম তখন ক্ষীয়মাণ আর অন্যদিকে ইসলামের আবির্ভাব। নবজাগ্রত ইসলাম কতকাংশে সেই ঈরানীয় আর বহুলাংশে আরবি। তৎসহ মিশ্রিত তুর্ক-তাতার-মঙ্গল ও ছিল। ভারতবর্ষের মাটিতে তারাও উপনিবিষ্ট এবং ভারতীয় ভাবনার মধ্যে সংঘর্ষ আর সমন্বয় দ্বারা গৃহীত। যে-কোনো কারণেই হোক, এই নবাগত ইসলামকে হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণে আগ্রহী হয় নি একেবারে অস্বীকার করতেও যে পারে নি, তার কারণ ইসলামের বলিষ্ঠতা এবং হিন্দু জীবন-চর্যায় একপ্রকার সক্রিয় সহিষ্ণুতা। এর মধ্যে অগ্রহণ আর বর্জন দুই-ই থেকে গেছে। এরও পরের পর্যায়ে হিন্দু আর মুসলমান ভাবনার আর আদর্শের স্বীকরণ আর আদর্শকে এক করে দেখার প্রয়াসও পাশাপাশি চলেছে সেই মহামতি আলবিরুনির সময় থেকে আজ পর্যন্ত। উভয় পক্ষই সংঘর্ষ সম্বন্ধে যতটা সচেতন—গ্রহণ সম্বন্ধে ততটা আগ্রহী এখনও নয়। তবু একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষ যেমন আর্যদের দেশ হয়েছে, প্রত্নদ্রবিড়দের দেশ হয়েছে, অষ্ট্রিকদের

ড. অরুণা হালদারের জন্ম ৮ই মে, ১৯১৮। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন রীডার। ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত এবং বাঙলা ভাষা বিষয়ে তিনি ছিলেন রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৬২-৬৪)। লেকচারট্যুর করেছেন জার্মানির হামবোল্ড ইউনিভার্সিটি এবং চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ে অনুশীলনের গভীরতা তাঁকে বিশেষজ্ঞের মর্যাদা দিয়েছে।

দেশ হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমন করেই তা আজ হিন্দু-মুসলমানের দেশও।

এই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মিশ্রিত জীবন থেকে এসেছে মধ্যযুগীয় সন্তরীতির উদার মতের কবিতা আর গীতিধারা। এসেছেন নানক, কবির, রবিদাস, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন (আধুনিক কাল পর্যন্ত)। এই ঐক্যমত ছাড়াও সংঘর্ষের পথে দেখা গিয়েছে ঠিক ইসলামের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে প্রবলপ্রতাপান্বিত শিখগণ। শিখ বা খালসাগণ আদর্শগতভাবে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই গ্রহণ করত। তারা দুর্ধর্ষ বীরও। রক্ত সম্পর্কে মনে হয় তারা সেই প্রাচীন কসাক (যুক্রেইনা) এবং সীমান্তচারী পাঠান—উভয়েরই সুদূর জ্ঞাতি। শিখ ধর্মকে পৃথক করে দেখানো এই-জন্য একটু কঠিন। তার বেশির ভাগই অদ্বয়-আল্লাহ (অলখ) এবং অন্যদিকে হিন্দুধর্মে অঙ্গীকৃত অদ্বৈত-ব্রহ্মের সমন্বয়। প্রবর্তক গুরু নানক মক্কাশরীফ দর্শন করে এসেছিলেন বলে বলা হয়। এটি প্রমাণিত করার মতো সাধন আমাদের হাতে উপস্থিত নেই। শিখ-ধর্মের উদ্দেশ্য বীরোচিত আদর্শ গ্রহণ। কেউ-কেউ বলেন, তাদের এই সংগঠন ইসলামবিরোধী হিসাবেই প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু তা বলা ঠিক হবে না। এ সংগঠনের মূল কাঠামো (যদি ইসলামবিরোধীও হয়) ইসলামের অনুসরণেই প্রস্তুত। এজন্য নানা কারণে শিখধর্মকে আমরা হিন্দু ভাবনা আর ইসলামের মিলিত মিশ্রিত রূপ বলে যদি ধরি, তা অন্যায় হয় না। ইসলামের আধার যদি কোরান হয়—শিখ ধর্মের আধার গ্রন্থসাহেব।

অনুরূপ সময়কার ইসলামীয় সুফীমত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, স্বয়ং দারাশুকোহ বা যুবরাজ স্বয়ং লালবাবা নামের এক হিন্দুতান্ত্রিক আর শেখ সেলিম চিশতীর শিষ্যত্বে একপ্রকার মরমিয়াবাদ (ফানাফিল্লাহ্) গ্রহণ করেছেন এবং জিক্‌র্ প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় চর্যাগুলি পালন করেছেন। তাঁর প্রাণনাশের মূলে অবশ্যই প্রধান কারণ ছিল তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব বা মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার কথা। কিন্তু তাঁর এই-সকল ধর্মচর্চা, ধর্মসমন্বয়কে অন্তরে উপলব্ধি করা এবং অবশেষে উপনিষদ্‌চর্চা এবং তার অনেকগুলি নিজে ফারসিতে অনুবাদ করা আর অন্যদের দিয়ে করানো প্রভৃতি কাজগুলি অবশ্যই গোঁড়া মুসলিম মহল ভালো চোখে দেখেন নি। তাঁর ভ্রাতা আওরঙ্গজেব এই সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যলাভের পথ থেকে তাঁকে দূরীভূত করে হত্যা করেন। অন্যদিকে সেই আওরঙ্গজেবকেও আমরা যতটা হিন্দুদ্বেষী মনে করি, ততটা সত্য নয়। তৎকালে রাজপুতগণ রাজাগণও কম হিংস্র ছিলেন না। পক্ষাবলম্বন করে রাজা অজিত সিংহ তাঁর জামাতাকে হত্যা করেন—তাঁকে 'দামাদকুশ' বলা হত। জয়সিংহ-যশোবন্তসিংহ পরস্পরকে সহ্য করতেন না। অতএব প্রতি ধর্মমতেই এরূপ গ্লানিকর ঘটনা সমর্থিত ছিল। ততদিনে আবারও ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতিরা ভারতভূমিতে এই নিয়ে চতুর্থবার এসে উপস্থিত হল ব্যবসাকল্পে। ইয়োরোপীয় অন্যান্য যে কটি জাতি আসে তারা পর্তুগিজ, ডেনিশ, ডাচ, ফরাসি এবং ইংরাজ। এরা সবাই একসঙ্গে আসে নি বা যায় নি। সর্বাগ্রে মনে হয় আসে পর্তুগিজ। তাদের চার্চও সবচেয়ে পুরাতন। একে-একে প্রত্যেকেই এরা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায়। বাকি থাকে পর্তুগিজ আর ইংরাজ। পর্তুগিজ জলদস্যুরা উপকূল অঞ্চলে আর হুগলী সপ্তগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘকাল ব্যবসা ও অত্যাচার চালিয়েছে। হার্মাদদের ভয় পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ছিল। হার্মাদা কথাটা "আর্মাডা" শব্দের বিকৃতি। এদেশের মাটিতে থাকতে-থাকতে তারা মেরী মাতাসহ কালীমাতার পূজাও করত। হিন্দুর ধর্ম-জীবনে কিছু উপদ্রব ঘটলেও হিন্দু-মুসলমানের মতো সংঘর্ষ হয় নি। অপর দিকে, এরা প্রত্যেকেই এদেশের ভাষা আর সামাজিক জীবনে অনেক অবদান রেখে গেছে। "ফিরঙ্গী" শব্দটা ব্যবহার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুসলমান শাসনের সাতশ বৎসর পরে ইংরাজ কোমপানি ব্রিটিশ মহারানীর নামে মুসলমানের হাত

থেকে শাসনভার একরকম ছিনিয়ে নেয়। বলা প্রয়োজন যে, হিন্দু ও মুসলমান একত্র হয়ে ১৮৫৭-১৮৫৮-তে তাদের বাধাও দিয়েছে। আবার উভয়েরই বিশ্বাসহন্তারা একত্র হয়ে ইংরাজকে সাহায্যও করেছে।

ইংরাজ শাসনের ১৯০ বৎসরে ভারতে সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম বহুভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশ ভেদনীতি অতি কুটিল পথে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পৃথকীকরণে সহায়তা করেছে। (এমনটি তারা আরব-অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনেও করেছিল নীতি হিসাবে)। এতে করে হিন্দু-মৌলবাদ এবং মুসলমান-মৌলবাদ উচ্চস্তরে পরস্পরকে অবিশ্বাস করতে থাকে। তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। ধর্মান্ধক দাঙ্গা সমগ্র ভারতে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে, লেগেই থাকে। ধর্মান্ধতার পরিণাম শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় গো-বধ নিয়ে। লোকে ভুলে যায় যে একটা পর্বের উপলক্ষে মুসলমানের ধর্মে কুরবানির ব্যবস্থা আছে। জীবহিংসা যদি পাপ হয়, তবে হিন্দুর বলিদানও নিশ্চয়ই হিংসাত্মক পাপ। আশ্চর্য এই যে, খ্রীষ্টান ইংরেজের খাদ্য হিসাবে গো-মাংস ও শূকরমাংস বিধেয়। আর ধর্মানুসারে যথাক্রমে প্রথমটি হিন্দুর এবং দ্বিতীয়টি সেমেটিক জু এবং মুসলিম—উভয়েরই অগ্রহণীয়। তা সত্ত্বেও এ নিয়ে গোলমাল হয় না। শেষোক্ত বিদেশীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা কিছু পরিমাণে হাস্যকর—অন্যদের কাছে অপরিহার্য ধর্মাদেশ। ঠিক যেমন আমরা জানি না যে হিন্দু কথাটি কবে থেকে ধর্ম হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তেমনই আমরা জানি না ঠিক কখন থেকে গোমাংসভক্ষণ এদেশীয় আর্যসন্তানগণ হিন্দুত্ব লাভ করে বর্জন করেছে। কোথাও তারা নিরামিষাশী—উত্তরে বা দক্ষিণে। কোথাও তারা মৎস্যাহারী। ব্রাহ্মণ হলেও মৈথিলী-ওড়িয়া-অসমীয়া-বাঙালি ও গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ আমিষাহারী। অপরদিকে ছাগবলি আর ছাগভক্ষণ, মৃগমাংস গ্রহণ অবিধেয় নয়। আদিবাসী অষ্ট্রিকগণ মুরগি আর শূকর বলি দিয়ে থাকে। হাতি মেরে মাংস খাওয়ায় নানা অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ধর্মে বাধে না। এদেশে কুকুর খায় না—কোথাও বা কালভৈরব শিবের অনুচর কুকুর। চীনে আর মালয় অঞ্চলে, নাগাভূমিতে কুকুর সুখাদ্য। স্বয়ং বুদ্ধদেব সম্ভবত শূকরভক্ষ্য খেয়ে মারা যান। ৮০ বৎসর বয়সে চুন্দের (চণ্ডাল হওয়া সম্ভব) আতিথ্য গ্রহণ করে শূকর ভোজ্য খান—তারপর অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই শূকর ভোজ্য শূকরমাংস হতে পারে—নয়তো শূকরের ভোজ্য বা মাশরুম হতেও পারে। আধুনিক পঞ্জিকায় কবে কোন্ তিথিতে বেগুন বা লাউ ভক্ষণের জন্য প্রশস্ত নয়, তাও হিন্দুধর্মে এখনও লেখা থাকে। ইয়োরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত লোকের স্তরটুকু পার হলে হিন্দুধর্ম এখনও মুক্তির সহায়ক নয়। এ মুক্তি বুদ্ধির মুক্তি বা মুক্তির বুদ্ধি। যুক্তি, আধুনিকতা, অনুকরণ—সব মিলিয়ে এদেশে হিন্দুত্ব থাকে টিকে। ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান আমাদের হিন্দুদের প্রবুদ্ধ করে নি। মূল্য-বোধ বিপর্যস্ত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক মানবীয়তা, যা সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ কথা, তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আধুনিক নিও-হিউম্যানিজমের অক্লান্ত প্রয়াসেও তার পুনরুদ্ধার বা পুনর্নবীকরণ ঘটছে না। এ-সকল ভ্রান্তির অসারতা, বাইরের চমৎকার, প্রত্যয়হীনতা—সব নিয়ে বর্তমানের 'হিন্দু-ধর্ম' বয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমাদের স্পর্শ করে নি :

এসো হে আর্য, এসো অনার্য হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।

হিন্দুধর্ম : পরিশীলন (চার্ট নং ৪ দ্রষ্টব্য)

আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে এবার একবার মোটামুটি একটা সিংহাবলোকন বা সার্ভে করে হিন্দু-ধর্মের বিকাশ থেকে আজকের তাৎপর্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। এজন্য আমাদের পূর্বোক্ত চার্ট দেখে চলতে হবে।

৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের আগমনের পূর্বে এদেশের কোনো ইতিহাস সংরক্ষিত নেই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় কিছু পাথুরে প্রমাণ আছে মাত্র। সংক্ষেপে বলা যায়, এই সময় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল আর বহু দেশের বহু সংস্কৃতি কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু মৌর্যবংশের পর থেকে বৌদ্ধধর্ম পশ্চিমোত্তর প্রদেশে সরতে বাধ্য হয়। অপর দিকে তৎপরবর্তী সুঙ্গবংশ বৌদ্ধবিরোধী 'হিন্দু' ছিলেন বলে বলা হয়। দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সঙ্কলিত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তদের সময় সঙ্কলিত মহাভারতে সংশ্লিষ্ট অনুশাসন-পর্ব এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে একটা সমন্বয়মূলক ধর্মভাবনা আমরা পেয়ে যাই। কৃষ্ণ-বিষ্ণু-রাম—এঁরা সকলেই বৈষ্ণব দেবতা, আর কৃষ্ণকথা দেবতা। গুজরাত-দ্বারকা অঞ্চলে আর তৎসমীপবর্তী স্থানে বাসুদেব পাঞ্চরাত্র মত প্রচলিত ছিল। এটি বৈষ্ণবও বটে, আবার তন্ত্রপ্রধানও বটে। এতদঞ্চলের যে যাদব ক্ষত্রিয়—তাঁরা সম্ভবত মধ্য এশীয় জাতি। দ্বারকা-প্রভাস, মথুরা-বৃন্দাবন, ও পরিব্রজপুর ব্যাপী তাঁদের চলাফেরা ছিল। এই জাতীয় অবতারবাদ আর ব্যূহবাদ সর্বপ্রথম ইসলামের সংস্পর্শে আসে অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে। এ সম্পর্কে খোজা মুসলমানদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমে সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বৈষ্ণবধর্মের একটা বড়ো ভূমি হয়ে ওঠে। মনে হয়, প্রথমাবধি বৈষ্ণব মতবাদ খুব অহিংস ছিল না। বৌদ্ধপ্রধান স্থানগুলির বৈষ্ণবীকরণ সেই উদ্দেশ্য-ভাবনাকে সমর্থন করে। এটি অনুমান মাত্র। দক্ষিণী দেশগুলিতেও বিষ্ণুদেবতা আঞ্চলিক বিশিষ্টতা অনুসারে রূপ পরিগ্রহ করে।

এইভাবেই দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণের কিছু অঞ্চল, আধুনিক উত্তর-প্রদেশ আর পূর্বোত্তর প্রান্তে দেখা দিয়েছে শিবপূজা। শিবসহ পত্নী পার্বতী, সতী, দুর্গা প্রভৃতি নামে পূজিতা। বস্তুত, শিবকে মঙ্গলের দ্যোতক আর গৌরী-পার্বতীকে জগন্মাতাশক্তির জনয়িত্রী বলে ধরা হয়। সুপ্রাচীন পুরুষ আর স্ত্রী আদি পিতামাতা বলে তাঁরা পূজিত। "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ"। খুব স্বাভাবিক-ভাবে এই উপাসনা তন্ত্রসম্মত হয়ে উঠেছে। আমাদের ধারণায়, মানবচেতনায় প্রজনন সম্পর্কিত সম্বন্ধপ্রাচীন-কাল থেকে এইভাবে স্বীকৃত হয়েছে, শুধু ভারতে বা হিন্দুধর্মেই নয়। প্রজাসৃষ্টির প্রয়োজন লোক-সংখ্যা বা লোকবল বাড়ানোর জন্যই। হিন্দুধর্ম ছাড়াও চীনা ধর্মশাস্ত্রে য়িন ও য়িন দুটি প্রজনন-সূচক শক্তির সতত সহাবস্থানের কথা স্বীকৃত।

হিন্দুধর্ম প্রজনন ব্যতীতও তন্ত্রপদ্ধতির কথা কল্পনা করেছে। এরকম তন্ত্র অন্য ধর্মেও আচার হিসাবে কোনো না কোনো ভাবে পাওয়া যাবে। এ বোধের কোনো প্রাচীন বা আধুনিক নাম যাই হোক, উদ্দেশ্য হল জীবনানন্দের স্বীকৃতি, এবং সেই আনন্দ প্রজননরহিত হতেও বা পারে। হিন্দুধর্মে এরূপ তন্ত্রাচার, বিষ্ণু, শিব, শক্তিপূজা এবং গণপতি-পূজার সঙ্গে অঙ্গীকৃত। এই বোধনা থেকে অজস্র শিল্পসম্ভার আর স্থাপত্যকলা ভারতের নানা প্রান্তে পাওয়া যাবে। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ও সেরূপ স্তবস্তুতি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কালে বস্তুত শুধু শিবের বা গৌরীর পৃথক কল্পনা প্রায় নেই। দুর্গাপূজার সমারোহের মধ্যেও মাতৃকাশক্তির পশ্চাৎপটে শিবকল্পনা আছে।

তন্ত্রাচার বৌদ্ধধর্মেও সংলগ্ন ছিল। পরে তা আঞ্চলিক প্রাধান্য পায়। বর্তমানে গুহ্যসাধনা হিসাবে কাশ্মীরী, কেরলী, বিলাসী (নাগপুর অঞ্চলে) এবং গৌড়ী—এই কটি মত বিদ্যমান। অরবিন্দদর্শন কাশ্মীরী শৈবতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এ ছাড়া অরবিন্দ দীর্ঘকাল বড়োদা অঞ্চলে 'লেলের' মতো আচার্যের সংস্পর্শে আসেন। বিষ্ণুতন্ত্র হিসাবে বাসুদেব পাঞ্চরাত্রের মত-বাদের উল্লেখ পূর্বেও করেছি। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব হবার পর যে বৈষ্ণব গীতিকবিতা পূর্ব-ভারতে ভজন-কীর্তনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়, বঙ্গন-হারা এক প্রেমাকর্ষণই তার মূলতত্ত্ব। এরও নানা শাখা তন্ত্রাশ্রিত হয়। আধুনিক আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায় একপ্রকার তন্ত্রাভিলাষী সম্প্রদায় বলা যায়। কৌতূহলোদ্দীপক এই সাধনা কোথাও "বৈষ্ণবী চক্র", কোথাও "শক্তিসাধনা"র রূপ পায়। বঙ্গদেশে গ্রামগঞ্জের কেন্দুলীর মেলা, সতীমার মেলা, অগ্রদ্বীপের মেলা এবং আরো এরকম তন্ত্রপ্রধান সাধকদের মিলনকেন্দ্র এখনও সামাজিক-ভাবে স্বীকৃত।

পূর্বোক্ত পদ্ধতি আলোচনা করার কালে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিব ও পার্বতী-গৌরী দুটি পৃথক উপাস্যতত্ত্বও বটে। অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব ও শক্তির উপাসনা পরস্পরসম্বন্ধও বটে আবার বিকেন্দ্রিতও বটে। হিন্দুধর্মের মূলপ্রোতে এই তিনটি উপাদান নানারকম প্রাচীন সংস্কার, লোকব্যবহার এবং সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণপদ্ধতির মধ্য দিয়ে মিলিত মিশ্রিত অবস্থায় বিরাজিত। আধুনিক যুগে এসেও এই নামগুলি তথাকথিত হিন্দুভাবনায় একদিকে প্রসন্নতা জাগায়, অন্যদিকে জাগায় হিংস্র উন্মাদনা। এইরূপ আগ্রাসনের ফলে একদিকে রচিত হয় আশ্চর্য কল্পনাযুক্ত দশাবতারস্তোত্র; তাতে একপ্রকার বিকাশ-বাদ বা বিবর্তন লক্ষ করার মতো যেমন—মৎস্য→কূর্ম→বরাহ→নৃসিংহ→অর্ধনর-বামন→বলরাম→হলধর→পরশুরাম-ধনুর্ধর→রামচন্দ্র রাজশক্তিপ্রতীক→বুদ্ধ-করুণাবতার এবং কল্কি-ধ্বংস শক্তি। সেই আগ্রাসনের ফলে বুদ্ধ হন বিষ্ণুর অবতার, ধ্বংস হয় বহু বৌদ্ধচৈত্য বা ধ্বংস না হয়েও অঙ্গীকৃত হয়ে যায় হিন্দু মন্দির বলে। একথা আগেও বলে এসেছি।

অত্যাধুনিক সমস্যায় মসজিদের অভ্যন্তরে "আবিষ্কৃত" রামমন্দির কল্পনাও তদনুসারী। ফলত, একথা বলা যায় যে ধর্মের অন্তরালে হিংসাও প্রশ্রয় পায়। বঙ্গাধিপ শশাঙ্কের সময় বৌদ্ধনির্যাতন কম হয় নি। আবার ইসলামসমাগমে এবং শাসনকালে হিন্দু-ধর্মও নির্জিত হয়েছে। বর্তমানকালে ইংরাজ শাসনের অবক্ষয়ের শেষ ধারায় সেই হিংসা উভয়ের মধ্যে রয়ে গেছে। এতে করে যে কথা আমি প্রথম এবং দ্বিতীয় চাটের সাহায্যে বলতে চেয়েছিলাম—সেই কথাই সমর্থিত হয়। যে-কোনো ধর্মমতের মধ্যে নিহিত আছে আদিম কালের হিংসা, লোভ, ভয়, আত্মরক্ষা আর আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং সুবিধাভোগের লোভে অনুসৃত শোধিত হিংস্রতা—এটাই সত্য। উপরিভাগে অবশ্য সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং সিদ্ধান্তের প্রলেপ আছে। তবে আমার একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে ধার্মিক ব্যক্তি বা ধার্মিকতা অবাস্তব বা অসম্ভব। যুক্তিবাদী মানুষও সজ্ঞানে শুভচেতনায় তাঁর নিজস্ব প্রেমময় বা শুভময় ঈশ্বর কল্পনা করতে পারেন। তাঁদের শুভবোধ বা ঈথস একটি ক্ষীণ ধারায় হাজার বৎসরে প্রায় এক মিলিমিটার মাত্র এগোতে পারে। কিন্তু তা মরে না। সেই হিসাবে যদি সে চেতনা ধর্মকে গ্রহণ করে থাকে তা শুধু সেইসব ব্যক্তিদের পক্ষেই সত্য ও সার্থক। সে-সকল মহৎ জীবনের কথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। মানবতন্ত্রাভিসারী সেসব দিশারি মানুষের নাম আবারও উল্লেখ করলে ক্ষতি নেই। বুদ্ধ, সক্রেটিস, লাওৎসে, কনফুশিয়াস, খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য), সিস্টার নিবেদিতা, সি. এফ. অ্যানড্রুজ এবং বর্তমানে মাদার তেরেজা। মধ্যযুগে ইসলামিক শাসনকালে মহম্মদের পর থেকে শ্রীচৈতন্যযুগের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা পাই আলবিরুনি, সম্রাট নসিরুদ্দীন, আকবর ও দারা শিকোহ্‌কে। এঁদের কেউ একেশ্বরবাদী, কেউ সুফীমতাবলম্বী এবং কেউ-বা মরমীয়াবাদী। কারো কাছে দেশাত্মবোধ ও জীবনসাধনা একত্রীভূত। আবার কারো কাছে দেশমাতা কালী করালীমূর্তি—তাঁদের কথা এখানে বাদ দিলাম। এগুলি ধর্মীয় জীবনের অন্তরায় আর ডিসিপেশন। সমন্বয়ের ইনটিগ্রেশনের ক্ষেত্রে পূর্বজদের সঙ্গে মিলরেখে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং মাদার তেরেজা অগ্রসর হয়েছেন; মার্টিন লুথার

কিংও বর্তমানের খ্রীষ্টের মতোই আত্মোৎসর্গকারী। বিবেকানন্দ শক্তিভক্ত—সে শক্তি রাজশক্তির বর্বরতাকে স্পর্ধা করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথও একেশ্বরবাদী—একদেববাদী নন। তাঁর মন্ত্র বা আহ্বান উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয় এবং সেটা এই ভারতের ধর্মজীবনের উপাদানগুলিকে একত্র করে তোলে।

হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

* * *

তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।

প্রকৃতপক্ষে ভারত আজ বহু ধর্মের বহু মানুষের দেশ এবং এই বাণীই তার মর্মবাণী, এবং যুগোপযোগী মন্ত্রও বটে।

পূর্বে বর্ণিত কাশ্মীর শৈবতন্ত্রমতের মধ্যে আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ না করে পারি না। এখানে প্রবল এক চলমান সত্তা নিরন্তর প্রবহমান। বুঝতে অসুবিধা হয় না এই অনিত্যতা বা প্রবহমানতা অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীয়মাণ বৌদ্ধধর্মের অবশেষ। তা না হলে কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধমতের একটা বড়ো কেন্দ্র। উক্ত সচলতার একটা হিন্দুনাম দেয়া হয়েছে মহেশ্বর, এবং দর্শনটি মহেশ্বরদর্শন বা প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন।

পূর্বোক্ত তিনটি দেবোপাসনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের আরম্ভ থেকে আধুনিক বিস্তৃতি পর্যন্ত আলোচনা করে এসেছি। বাকি থাকে আরো ছুটি দেবতার বিশিষ্ট স্বীকৃতি। এর একটি হল সৌর বা সূর্যোপাসনা। এটিকে কাশ্মীরকেন্দ্রিক বলা হলেও পূর্বাঞ্চলেও তার প্রসারতা আছে। সূর্যোপাসক শকজাতি (মগ বা ম্যাগি বলা হত পুরোহিতদের) শগডিয়ানা বা পূর্ব ইরান হয়ে কাশ্মীরে এসে থাকবে। অথবা তাদের উভয় দেশে সাংস্কৃতিক আনাগোনা ছিল। এই শগডিয়ানা বা শকস্থানীয় পুরোহিতগণ মগধে, উড়িষ্যায়, পূর্বোত্তর বঙ্গে প্রচুর আছেন। কাশ্মীরের মার্তণ্ডমন্দির, কোনার্কের সূর্যমন্দির, বিহারে দেবগ্রামের সূর্য-কুণ্ড আর -মন্দির এবং পূর্বোত্তর বঙ্গের স্যুট-বুট-পরা উৎখনিত সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে। তবে সূর্যোপাসনা খুব বেশি প্রসারিত হয় নি যেমন অন্য তিনটিতে হয়েছিল। শক ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাবিদও ছিলেন আদিতে। সূর্যপূজা আর কুষ্ঠরোগ—এ দুটি কীভাবে পরস্পরসন্নিবিষ্ট হয়ে আছে তা আমরা জানি না। কৃষ্ণকাল্টও এর সঙ্গে অংশত জড়িত। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব বলা হয় কুষ্ঠরোগী ছিলেন এবং তিনিই নাকি এই শক পুরোহিতদের আনেন। বর্তমানে গয়াধামের বিষ্ণুমন্দিরের পুরোহিতদের দেখলে একটা অমিশ্র বংশধারার কথা মনে না পড়ে পারে না—নীলচক্ষু, সুদর্শন, সুগৌর এই সম্প্রদায় পুরাতন পারসিক বংশোদ্ভূত বলা চলে। কোনার্কের মন্দির বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্মিত। যে কারণেই হোক, মন্দির ভেঙে যায় বা ভেঙে দেয়া হয়। বিহার অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ছটপূজায় সূর্য, ধরিত্রী আর গঙ্গার উপাসনা ঋতু অনুযায়ী দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। একটি কার্তিকী ছট দক্ষিণায়ণকালে, অন্যটি চৈতী ছট উত্তরায়ণকালে। মনে হয়, তিনের সমবায়ে যে উর্বরতা আর শস্য উৎপন্ন হয়—এটা তারই স্বীকৃতি, একপ্রকার প্রকৃতিপূজাও বটে। শুধুমাত্র সৌরপূজা ও এই সূর্যোপাসনা—আজ পাওয়া শক্ত। প্রায় ক্ষেত্রে তা নবগ্রহের উপাসনায় প্রধানতা পায় এইমাত্র।

সৌর কাল্ট ব্যতীত অন্যটি হল গাণপত্য কাল্ট বা বিনায়ক-গণপতির পূজা। দক্ষিণাঞ্চলে তো বটেই, উত্তরাঞ্চলের সমস্ত মন্দিরে এই হস্তিমুখ, পার্বতীপুত্র গণেশ সর্বাগ্রে স্থাপিত আর পূজিত দেখা যায়। তাহলেও মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যেই এ পূজার প্রচলন অধিক। গণপতি বর্তমানে সিদ্ধির দেবতা—শিব-পার্বতীর পুত্র এবং তিনি লেখকও বটে। মহাভারত-কথার কথাকার ব্যাসদেব হলেও গণপতি তার লেখক। এই রক্তবর্ণ, স্থূলকায়, খাণ্ডরসিক, হস্তিমুখ গণেশ অনুমান করি কোনো এক প্যাস্থিয়ন থেকে নেওয়া নয়। গল্পকাহিনী যাই হোক—হস্তিকে টোটেম

ধরে গণপতির দিকে অগ্রসর হলে পর অনুমান করা যায়, গণপতি একপ্রকার লোকনায়কও বটে। তাঁর অন্য নাম বিনায়ক ও সিদ্ধিদাতা। কোনো লোক-নায়ককে দিব্যজীবন দিয়ে দেবতা বানানো নতুন কথা নয়। চোখের সামনে গান্ধী পূজিত হচ্ছেন। লেনিনের মরদেহ এতদিন মমি করে রাখা হয়েছে এবং ভক্তগণের কাছে প্রদর্শিত হচ্ছে। মনে হয়, কালক্রমে মানবপ্রজাতি বেঁচে থাকলে এইভাবে দেবসংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। গণপতি নামটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

আমরা হিন্দুধর্মের আদিতে এই পঞ্চোপাসনা নিয়ে শুরু করতে পারি। তার পূর্বে গৃহীত হয়েছে প্রস্থানত্রয়। বেদ, উপনিষদ ও মহাভারত (কারো মতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)। এরপর এল এই পঞ্চোপাসনা এবং তার আনুক্রমিক বিস্তৃতি ও পূজাপাঠ-আহ্নিকের ব্যবস্থা। রচিত হল পুরাণ আর উপ-পুরাণ। তার সঙ্গে ধর্মসুরক্ষার জন্য প্রয়োজনমতো ধর্মশাস্ত্রাদির ব্যবস্থা রইল। তা সত্ত্বেও যুক্তিবাদী মন তৃপ্ত হয় নি। তাকে দর্শনের আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে। প্রমুখত দর্শন যুক্তিবাদী, এবং সে কারণে বেদবিরোধী হতে পারে। এটা জেনে, ছটি অস্তিবাদী দর্শন বা বৈদিক দর্শনের সূত্রপাত হয়েছে। এই ছয়টি দর্শন হল ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ এবং পূর্ব মীমাংসা-উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত)। এককালে মনে হয় সবকটিই নিরীশ্বরবাদী ছিল। ক্রমে ন্যায়ানুসারে ঈশ্বরকল্পনা নিত্যবস্তু বলে ধরা হল। যোগদর্শন অবশ্য অস্তিবাদী নাস্তিবাদী দর্শনগুলিও গ্রহণ করেছিল (চার্বাক বাদে)। সাংখ্য হয়ে উঠল সেশ্বর সাংখ্য এবং যোগের প্রধান পুরুষ ধরা হল ঈশ্বরকে। পূর্ব-মীমাংসা আর নিরীশ্বর-বাদী দর্শন—তাতেও বেদকে প্রমাণ মানা হল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে কল্পিত বিরাট্ বা পুরুষই বৈদিক ঈশ্বররূপে দর্শনগ্রাহ্য হলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করার কল্পে বলা হল, সকল কিছুই সেই বিরাটের থেকে সম্ভূত হয়েছে। তাঁর মাথা ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়, পাদদ্বয় বৈশ্য এবং পদতলমাত্র শূদ্র। সেইমতো দেখাও গেল তথাকথিত দরিদ্র এবং শূদ্র নরনারীর জীবনের দুর্গতি। অপরাপর শ্রেণী ধর্ম-মনস্কতার আশ্রয়ে তাদের নির্জিত করেছে, অথচ অধিকার দেয় নি। শূদ্র-স্ত্রী যেন সর্বজনভোগ্যা। ধর্মনীতির আশ্রয়ে রাজনীতি পুষ্ট হয়েছে। মহাভারতের যুগে ধনুর্বিদ একলব্যকে গুরু হিসেবে দূর থেকে স্বীকৃত হলেও গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনার্থে পত্নীকে সমাজে অসম্মান করেছেন এবং শূদ্র তপস্বীকে নিধন করেছেন। শেষোক্ত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন মহাভারতকার ব্যাসের নাম বহন করে। দশম খ্রীষ্টাব্দে আচার্য শঙ্কর তাঁর শারীরকভাষ্য দিয়ে সেই দর্শনসূত্রের ব্যাখ্যা করেন। শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন" শুধু কেন, প্রকট বৌদ্ধ বললেও অসঙ্গত হয় না। অতি সুন্দরভাবে তিনি মহাযান মতের বিজ্ঞানবাদদর্শনকে হিন্দুমতে ঢেলে সাজিয়েছেন বলা যায়। "আলয়বিজ্ঞান" আর "ব্রহ্ম" সমার্থসূচক। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ। তাঁর কৃত মাণ্ডুক্যকারিকার ব্যাখ্যাতেও সেই একই তত্ত্ব উপস্থাপিত। অথচ শঙ্করাচার্যকে সাক্ষাৎ শঙ্কর বলা হয়। শঙ্করাচার্যের দর্শনমতে ঈশ্বরসিদ্ধি, যোগ-সাধনা সবই ব্যবহারিক বলে বলা হয়েছে। পরমার্থত সবই মায়া বা অসৎ। তৎসত্ত্বেও শঙ্করাচার্যকৃত বহু শ্রুতিসুখকর দেবদেবীর স্তোত্র আছে। সেগুলি লেখাতে হিন্দুধর্মের বা শঙ্করাচার্যের হিন্দুত্ব কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ভাবনা ও হিন্দু সমাজের পরম্পরার মধ্যে এই স্ববিরোধ এবং অসংশ্লেষিত বহু উপাদান রয়ে গিয়েছে এবং সংগৃহীত হয়েছে। নূতনতর সংযোজনের মধ্যে গণেশ-জননী, গণেশ প্রমুখ দেবতার পরবর্তী প্রজন্মের। বর্তমানে গণেশকন্যারূপে কোনো সন্তোষী মাও পূজিত হন। তাঁকে "তুষ্টি" বলা হয়েছে এবং এ "তুষ্টি" কথাটা মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতেই আছে।

দশম খ্রীষ্টাব্দ থেকে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা

দেখেছি হিন্দুধর্মের পটভূমিকাতে হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত মনের ফসল হিসাবে উত্তর ভারতে সন্তরীতির কবিতা আর সঙ্গীতের আবির্ভাব। এ নিয়ে পূর্বে আলোচনাও করেছি। একই পরিপ্রেক্ষিতে চলেছে ধর্ম ও নবতর ধর্ম নিয়ে দরবারি আলোচনা। তারই মধ্যে থেকে সৃজিত হয়েছে শিখধর্ম। এটি একেশ্বরবাদী ধর্ম, অনুমান করি তৎকালে ইসলাম প্রভাবিত। তা সত্ত্বেও তার মধ্যে হিন্দুরীতির অভাব নেই। হিন্দুধর্ম অন্তত তাকে সরিয়ে রাখে নি, ইসলামকে যেমন রেখেছিল। অপর পক্ষে, আধুনিক কালের রায়টের সময় যাই হোক শিখগণ হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দেবদেবীকে উপেক্ষা করে না। এটা তাদের ধর্মীয় উদারতা বলে মনে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শিখধর্মমন্দিরে যাতায়াত করতেন—সমাদৃতও হতেন। শিখধর্মের উপস্থাপনার লক্ষ্য একেশ্বরবাদিতা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শক্তি এবং সাহস, সঙ্ঘবদ্ধতা আর নির্ভীক সমরকুশলতাও তাঁদের পঞ্চ 'ক' ব্রতধারণ সবই আমাদের ইসলামতত্ত্ব মনে পড়িয়ে দেয়। (পঞ্চ ক=কেশ, কচ্ছা, কড়া, কঙ্গ, কৃপাণ।) এ ধর্ম হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করে চলেছে।

ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে নববৈষ্ণবধর্ম আবির্ভূত হল সেটি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে উভয়ত ইসলামের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছে। আমরা সে বিষয় আগে উল্লেখ করেছি। ভগবৎপ্রেমের রোমানটিকতা একপ্রকার মুগ্ধদ্বন্দ্বময় মনুষ্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ আত্মোত্তরণ বলা এক্ষেত্রে অসঙ্গত হবে না। চৈতন্যদেবও ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন না। হয়তো সেটা একটা কারণ হতে পারে যেজন্য তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক স্ববিরোধী কথা এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে ধর্মজিজ্ঞাসার মধ্যে এসব প্রশ্ন দেখা না দিয়ে পারে না। চৈতন্যদেবের ধর্মদেশনার পরে আশেপাশে অনেক প্রকারের কষ্টকল্পিত বৈষ্ণব মত এবং বৈষ্ণব দর্শন দেখা যায়। চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিপূরক দর্শনের নাম অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। তিনি মনে হয় দক্ষিণ ভারত থেকেই এই ভক্তিবাদ গ্রহণ করেছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত আর ব্রহ্মসংহিতার নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়।) আর সেই সঙ্গে ভারতের অন্ধকার যুগে উত্থিত হয় অনেক ছোটো-খাটো লৌকিক দেবদেবী এবং তাদের ব্রতকথা। এ-গুলির প্রায় সবই গ্রামীণ শস্যোৎসবের সঙ্গে জড়িত আর গীতি হিসাবে বর্ণিত ও কথিত। তুসু, ভাদু, লক্ষ্মীর পাঁচালী, ভজনকীর্তন, পট দেখিয়ে গান, পুতুলনাচের মাধ্যমে গান, রামায়ণ, শিবায়ন, অষ্টমঙ্গলার গান—এসবই হিন্দুধর্মের প্রায়ান্ধকার যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সমাগত। অজস্র সাহিত্য, সমাজসমালোচনা, গুণ-গ্রাহিতা—এগুলি ব্যক্ত হয়েছে এসব মাধ্যমের বা লোকগীতি, লোককথার মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মিশ্রিত প্রয়োজনে-আয়োজনে দেখা দিয়েছে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পুজা আর কথাকীর্তন। আবার অন্যদিকে উভয় পক্ষের পুরোহিত-তন্ত্রের মাধ্যমে বার হয়ে এসেছে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা আর ঘাত-প্রতিঘাত। প্রশ্ন উঠতে পারে যে হিন্দু-ধর্মের আলোচনায় এ কথা কেন আসে। আসে এইজন্য যে এখন পর্যন্ত ভারতে দুটি প্রধান ধর্মমত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—তাদের রূপ প্রায় যুযুধান। তবে সেটা চাপা থাকে। যাঁরা হিন্দুধর্মের উদারতার কথা বলেন, তাঁদের আজ একথা ভাবতে হবে যে মানুষের পরিচয় হল 'মানুষ' হিসাবে। এটাই প্রথম। তারপর অবশ্য সে কোন্ ধর্মমতে, কোন্ কুলে, কোন্ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। আধুনিক বিচারে সে আবার বিশ্ব-নাগরিকও। অপর দিকে, হিন্দুধর্মের পাশাপাশি কত অন্ধ সংস্কার, কত জাতিভেদ নিয়ে আত্মকলহ—নিত্য বর্তমান থেকে তার ভিত্তিমূল ক্ষয় করে আনছে তা হিন্দুরা দেখেও দেখে না। দেখতে গেলে তা একটা উৎকট উৎকণ্ঠার কারণ হয়—কোনো শিক্ষাদীক্ষার প্রসন্নতা সেই বিপদের আকস্মিকতাকে ঠেকাতে পারে না। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইয়োরোপীয় তথা ব্রিটিশ নীতিও ধর্মীয় ভাবনার সেই মৌলিক অন্ধকার দূর

করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম রয়ে গিয়েছে এবং নানাভাবে নানারূপে তা আবার বিদেশেও স্বীকৃতি পাচ্ছে।

হিন্দুধর্ম—পরিশীলনপর্ব (নব্য হিন্দুধর্ম)

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষ ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ হয়ে ওঠে। তার এই পরিণতির যুগে একদিকে ভারতবর্ষ মনে করেছে অংশত তার নবজাগৃতি বা রেনেশাঁস। অবশ্য, তার এ রেনেশাঁস সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পায় নি। এর মধ্যে তার একাংশ সর্বভারতীয় এবং সার্বিক প্রতিনিধি হবার স্বপ্ন দেখেছে। প্রসঙ্গত রাজা রামমোহনের কথা ধরা যাক। তাঁর বহুশ্রুত হিন্দুশাস্ত্র, কোরান এবং খ্রীষ্টধর্ম আলোচনা করে এক নবীন একেশ্বরবাদের কল্পনা করেছে। মুসলমান মৌলভীগণও তাঁর আরবি আর ফারসি পঠন-পাঠনে বিস্মিত বোধ করেছেন। অপরদিকে তাঁকে হিন্দুতান্ত্রিক সাধকও কেউ-কেউ বলেছেন; (যেটা খুব মানানসই হয় না তাঁর চরিত্রের সঙ্গে); কেউ তাঁকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন। আবার এও সত্য যে, তাঁর ভাবধারায় গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁর প্রতি সামাজিক নির্যাতন কম করে নি। সতীদাহ-নিবারণে তিনি উদ্যোগী ছিলেন, ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা, ইয়োরোপীয় ভাবনার আলোতে স্বদেশের নয়ন মেলে চাওয়া—তাঁর ঈপ্সিত ছিল। নেপল্‌সের স্বাধীনতা যাবার খবরে তিনি স্বগৃহে খানাপিনার নির্ধারিত এক উৎসব বাতিল করেন। রাজ্যচ্যুত ভারতসম্রাট বাহাদুর শাহর পক্ষ নিয়ে দেওয়ান হিসাবে তিনি তৎকালে লনডনে সুপ্রীম কোর্টে আপীল নিয়ে যান। এটি করেন স্বদেশের জন্যে। এ স্বদেশ তাঁর কাছে সর্বাধিক ভারতীয়ের দেশ। আমরা এ চিন্তার জন্য তাঁর কাছে ঋণী। অপর দিকে, তাঁর প্রেরণায় বহু-উপাদানপ্লাবিত হিন্দুধর্মের সার সঙ্কলন করে তিনি ব্রহ্মসভা বা আত্মীয়সভা স্থাপন করেন। এটি হল অধুনা ব্রাহ্মধর্মের মূল উৎস। ধর্মের ঐক্য আর ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব প্রতিপাদন এ ধর্মের লক্ষ্য ছিল। যুক্তিবাদপ্রবর্তিত এই ধর্মদেশনা এ দেশে নূতন এবং অবশ্যই তিনি এজন্য হিন্দুর কাছে বহুনিন্দিত হয়েছিলেন। এরপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ। তিনি উপবীত ত্যাগ করেন নি—মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিলেন। মহর্ষিও ফারসি জানতেন। হাফিজ এবং সুফীকাব্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সন্দেহ নেই যে, পুত্র রবীন্দ্রনাথও সেই ট্রাডিশনের উত্তরসূরী হিসাবে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর কাব্যে যা প্রকাশ পায় তা এক আনন্দময় মহাশক্তি—অফুরন্ত তার সৃজনশীলতা, তিনি সত্যমঙ্গল, প্রেমময় এবং অন্ধকারে তিনি এক ধ্রুবজ্যোতিপ্রদর্শক। আরো পরে এই আদি ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে নববিধান সম্প্রদায় এবং তারো পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত হয়। প্রেমময় পরমেশ্বর এবং তাঁর প্রবর্তিত নীতি আর তাঁর চলার পথে সুকৃতি মানুষের লক্ষ্য হবে, আদর্শ হবে এইরূপ নীতিবাক্য হিন্দুসমাজে তো ছিলই; উপরন্তু বোধ করি সকল ধর্মেরই এটা সাধারণ মর্মবাণী। আজকের জীবনে উপরিউক্ত ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ থেকে পৃথকীকরণ খুব সম্ভব হয় না। মুসলমান বা খ্রীষ্ট ধর্মের মতো ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ থাকার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই দেশ এবং তার জাতিপংক্তিবিচার। ভিতরে-ভিতরে একটা জাতিভেদ এবং সূক্ষ্ম ব্যবধান থেকে যায়, এমন একটা কঠিন সত্যের অনুভব হয়। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম মূর্তিপূজা-বিরোধী এবং একেশ্বররাদী। অপর পক্ষে, হিন্দুধর্ম বহুদেববাদী, আবার একই সঙ্গে মূর্তিপূজকও বটে। মূর্তি বা প্রতিমাকে প্রতীক বা সিম্বল বলা হয়। দর্শনমীমাংসায় অরূপ সত্য বা ব্রহ্মের স্থান আছে; অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শক্ত্যাদ্বৈতবাদ, শৈবাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে এক এবং অনেকের সম্পর্কের সম্যক সমাধানের প্রয়াসও করা হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম কিংবা সমসাময়িক দয়ানন্দ স্বামী-প্রবর্তিত আর্যসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা

রিফর্মড হিন্দুইজম বলা যায়।

এবম্প্রকার হিন্দু সমাজে আসেন বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শেষোক্ত জন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন অথচ পরবর্তী কালে পুরাণাদি আশ্রয় করে নব্যহিন্দুধর্মের অনুসারে মহাকাব্যের নায়কদের প্রয়োজনমত সংস্কার করেন। হিন্দু সমাজে অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদে এখনও পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ চলে। তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলন এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন করে গোঁড়া হিন্দু সমাজের একান্তবিরাগভাজন হয়েছিলেন। সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে কিছুকাল পরেই এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। প্রথম জনার নাম এজন্য করতে হল যে তাঁর রচনায় ধর্মাধর্ম প্রতিফলিত হয়েছে। সেদিক থেকে বঙ্কিম বড়ো স্ববিরোধী। তাঁর উত্তম রচনা অতি সুন্দর—হিন্দু-মুসলমান-নিরপেক্ষ কয়েকটি মানুষের চরিত্র, শিক্ষাভিমানী বিত্তবান মানুষ আবার দুঃখী মর্যাদাময় মানুষ—সবারই আমরা দেখা পাই। দেখা পাই পরিশীলিত ইয়োরোপীয় পজিটিভিসটিক ভাবনার। তারই সঙ্গে সহাবস্থান করে তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্র এবং প্রো-হিন্দু মনোভাব। তাঁর স্বাদেশিকতার মহিমা এতে করে ক্ষুণ্ণ প্রতীত হয়। অপরদিকে ঠিক বিপরীত চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর শিক্ষা সামান্য—পূজারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি জাতিগংক্তি মানে না—তাঁর মতো করে তিনি হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান প্রভৃতি মূলধর্মের নিহিত তত্ত্বগুলি কাজে এবং অভ্যাসে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন সর্বধর্মের একত্ব। কতটা সফল হয়েছেন তা বলা সম্ভব নয়। কারণ ধর্মের তত্ত্বের মধ্যে ও তাকে সত্য করার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রায় নেই। তা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতীন্দ্রিয়বাদের প্রজ্ঞাতা-মাত্র নন, তিনি বাস্তবেও বারবার সেই অনুভূতিকে অবাঙমানসগোচরতাকে প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে আনতে চেয়েছেন এটাই সত্য। তাঁর কাছে মানুষের আন্তরিকতাই সত্য বলে গৃহীত হত। এদিক দিয়ে তাঁকে রেনেশাঁসের অপরতম উদ্‌গাতা বলা চলে। এই হিন্দু রেনেশাঁসের আন্দোলনে জাতিভেদ প্রায় ছিল না—হিন্দু, ব্রাহ্ম, বোধ করি মুসলমানেরও অবারিত দ্বার ছিল। যদিও খোঁজ করে দেখেছি পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত দেশী-বিদেশী খ্রীষ্টান অনেক হলেও মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। কম হলেও তবু দু-চারজন ছিলেন সঙ্ঘের মধ্যেই। ব্রাহ্মণ হলেও তাঁকে ব্রাহ্মণের উপরে প্রকৃত মানবমহিমার অধিকারী বলা যায়। তাঁর পত্নীর কথা আরো বিচিত্র। ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা তিনি—গ্রাম-ঘরেও তাঁর জাতবিচার ছিল না—প্রয়োজনে হিন্দু-ভক্ত আর মুসলমান কর্মীর তিনি মাতৃরূপা হয়ে উচ্ছিষ্ট তুলতে পরাঙ্মুখ হন নি—খ্রীষ্টান ভক্তদের মধ্যে নিবেদিতা বা ক্রিস্টিনের কাছে তো তিনি জননীই। নব্য-হিন্দু ধর্ম প্রবর্তনায় এ দম্পতির অবদানের তুলনা নেই। সেই পথে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথম যৌবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ছিলেন। তিনি এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমসাময়িক। দুজনেই নব্য-হিন্দু সংস্কৃতি আর মানবধর্মসাধনার পথে দুই মহান প্রবর্তক এবং দ্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম একপ্রকার সত্য, শিব আর সুন্দরের সমন্বয় এবং সতত সৃজনশীল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা, শিক্ষা, সমাজনীতি, রাজনীতি তথা তাঁর বৈশ্বিক দৃষ্টি—একই সঙ্গে ক্রমোত্তরণ এবং আত্মবিমোচন। তিনিও নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়ে আশ্রমজীবনের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি আত্মদ্রষ্টা ও বিজ্ঞানের পথেই সে কাজ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বর্তমান কালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরিচয় করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর প্রভেদ ছিল। আবার রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে এক মহৎ যোগাযোগের শক্তি ছিলেন আইরিশ হোম রুলের কর্মী ভারতপ্রেমিকা সিস্টার নিবেদিতা। অন্যদিকে তেমনই রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজীর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতেন মহামতি সি. এফ. অ্যানড্রুজ।

নব্য হিন্দুধর্ম প্রবর্তনায় যেমন পূর্বোক্ত কাউকেই

বাদ দেওয়া যায় না, তেমনই বাদ দেওয়া যায় না সবশুদ্ধ ঠাকুরবাড়িকেও। তাঁদের পিরালী পরিবার এমনই অনেক বাধা ভেঙে বার হয়ে এসেছিল। যে ভাবেই হোক, এ পরিবারের ক্রমবিকাশের পথ শুরু হয়েছিল নবাব সরকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম করার মধ্য দিয়ে। সেজন্য তাঁরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম যাই হন, তাঁদের বিচার-বিবেচনা-খাদ্যাখাদ্য-পোশাক-ভাবনার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। এ বিশেষত্ব তৎকালীন কলকাতার বেনিয়ানদের বা উঠতি ধনীদের মধ্যে পাওয়া যেত না। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের কথা পূর্বেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি নয়—কিন্তু সে দৃষ্টি তৎকালে সমগ্র বিশ্বের মনীষীগণকে স্পর্শ করেছিল। সে দৃষ্টি ছিল নব্য-মানবতাবাদের। এ মানবতা বিজ্ঞানসমৃদ্ধ এবং কর্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঐশী শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সে-বিশ্বাস তাঁর পরিণত মনস্বিতাকে খর্ব করে নি। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে মহতী শক্তি সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে উদ্ভাসিত, এমনই কোনো প্রেরণা তাঁকে অসামান্য এক মানুষ করে-ছিল অথচ অমানবিক করে নি। তিনি বোধ করি একমাত্র মানুষ (আমার জানা জগতে) যিনি ধর্মের মধ্যকার মানবসংস্কৃতির ভিতরকার অবরুদ্ধ হিংসাত্মক দিকটাকে ধরতে পেরেছিলেন। "সভ্যতার সঙ্কট" গ্রন্থে তিনি এই রুদ্ধ হিংসার হিংস্রতার প্রকাশকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। গান্ধীজীর অহিংসনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। সে কথায় পরে আসছি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন হিংসা কখনও চাপা থাকে না। এবং হিংসাত্মক পথে কোনো সত্যের সার্থকতা মেলে না। তাঁর কথা যে সত্য তা আমরা বর্তমান কালেও বুঝতে পারছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে তাঁর ধ্যাননেত্রে তিনি এই মারাত্মক লোভকে, জাতি-প্রেমের নামে সুযোগসন্ধানকে স্বরূপত চিনেছিলেন। আমেরিকার বর্বরতাকে তাঁর চিনতে ভুল হয় নি। এ বিষয়ে তিনি অনেকখানি রম্যাঁ রলাঁর সমমনস্ক এবং কিছু পৃথকও। রম্যাঁ রলাঁ বাস্তববাদী ফরাসি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক হলেও তৎকালীন পরাধীন ভারতের মানুষ। তৎকালীন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ তাঁর অজানা ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি হিংসাত্মক মনোভাব সমর্থন করেন নি।

তিনি গান্ধীবাদের আপাতত অহিংসাত্মক ভাবনা এবং তাঁর অচ্ছুত বয়কট নীতির মধ্যেও সেই হিংসাকে আবিষ্কার করেন। গান্ধীজীর তৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে চরখাকাটা কৃচ্ছ্রসাধনা এবং রাম-রহিমের একীকরণ হয়তো কিছু মানুষের জন্য উপকারক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ দরিদ্র ক্ষুধিত দেশে শিক্ষা বয়কট, বিলাতি বস্ত্র বয়কট করার মধ্যে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পান নি। তেমনি ভাবে তিনি চাইতেন দেশের মানুষের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি আর বিজ্ঞানসচেতনতা। তাঁর কাছে যতটুকু সম্ভব এই পথই গ্রহণযোগ্য, একমাত্র সাধনার পথ বলে মনে হয়েছিল। মানুষের দেবতাকে তিনি স্বীকার করেছিলেন—দেশবিদেশে পাশ্চাত্যভূমিতে আরব দুনিয়ায় নবজাগ্রত চেতনায় তাঁর মানুষের ধর্ম যোগ্যতম এক বিশিষ্ট অবদান। এখন পর্যন্ত এ স্থান অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারেন নি।

অপর দিকে, গান্ধীজীকেও নব্যহিন্দুধর্মের আর-একজন প্রবক্তা বলতেই হয়। তিনিও বিদেশে স্বীকৃতি-প্রাপ্ত মানুষ। স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁর সম্বন্ধে বলে-ছিলেন—এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভাববে যে গান্ধীজীর মতো একজন মানুষ পার্থিব ভূমিতে কখনও চলাফেরা করে বেড়াতেন। বিদেশী, বিদেশিনী ভক্তসংখ্যা তাঁরও কম ছিল না। কিন্তু তাঁর পথকে বোধ করি তাঁর সময়কার জৈন ব্যবসায়ী শ্রেণীর পথ বলা যেতে পারে। অন্তত জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই ব্যবসায়ী-কুলের প্রতিভূস্থানীয় ছিলেন—তাঁর পোষকতা তাঁরাই করতেন, যাঁরা বুঝেছিলেন ব্রিটিশ বণিক গেলে পর তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে এই ভারত-ভূমির শাসক হবেন। তাই-ই হয়েছে—এটা আমরা

চোখেই দেখি। এ সত্ত্বেও তাঁর অহিংসার বাণী রম্যাঁ রলাঁর মতো লোককেও স্পর্শ করত—বিশেষ করে সেদিনের সেই যুদ্ধক্লিষ্ট ইয়োরোপে রম্যাঁ রলাঁও যখন হিংসার কারণে নির্বাসিত। তবুও গান্ধীর রাজনীতির পথে হিন্দুধর্মকে টেনে আনা আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়।

যা ঘটে তাই সত্য—এটা আমরা জানি। কিন্তু এ সত্যকে তো মানুষই ত্বরান্বিত করে বা ঘটাতে সমর্থ হয়। গান্ধীজীর হরিজন উন্নয়ন, হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করে আল্লাহ্ আর রামকে একীকরণের একটা অনর্থযুক্ত অপরিণতমতিত্ব—এগুলি গোঁড়া হিন্দু-ধর্মেরই অপর দিক। দুঃখজনক কথা এই যে গান্ধীজী এদিকপানে চোখ ফেরান নি। ফেরালে হয়তো বুঝতেন, অনধিকারীর হাতে ক্ষমতা বিড়ম্বনাগ্রস্ত হয়—এও তিনি বুঝতেন জোর করে একবার একসাথে বসে খেলেই চিরদিনকার মতো জাতিভেদসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। একটা বড়ো কথাও তিনি সম্ভবত ইচ্ছা করে ভুলে থাকতেন—কারণ, কথাটা তাঁর মতো ব্যারিস্টারের চোখে না পড়ার মতো নয়। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, স্বয়ং আজাদ সাহেব শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী কংগ্রেস সেবক হয়েই এদেশে মৃত্যুবরণ করেন। গান্ধীজীর পরমত-অসহিষ্ণুতাকে চাপা দেবার জন্য যদি রামনাম অত বেশি না প্রচারিত হত, তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়তো দেশভাগের প্রয়োজন হত না। তিনি যত মহৎই হন, পরমত-অসহিষ্ণুতার কারণে পথ থেকে দেশবন্ধুকে এবং নেতাজীকে তাঁর পথের কাঁটার মতো ভেবেই তিনি সরিয়ে দেন। অপরপক্ষে মনে হয়, দেশবন্ধুর তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে সংখ্যাভিত্তিক ৫০% সংরক্ষণ-ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ফলটা অন্যরকম হত। তিনি যতই রামনাম দিয়ে রহিমকে এক করতে চেয়েছেন, ততই রামের আড়ালে রহিম চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কা জেগেছে রহিম-উপাসকদের মনে। আশঙ্কা, সংশয় আর পরাজয়ের ভীতি নিয়েই তাঁরা শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বিধানে ধর্মীয় আন্দোলনের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠন করতে প্রয়াসী হন। ইংরাজ স্বদেশে অসামান্যগুণসম্পন্ন। কিন্তু বহির্বিশ্বে তার ভেদনীতি সর্বজনস্বীকৃত। সেই নীতির কাছে গান্ধী নিজে পরাজিত হলেন। তাঁর নীতিতে যে সুপ্ত হিংসা ছিল, পরবর্তী কালে সেই হিংসার বলি হয়ে তিনি নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করলেন প্রাণ দিয়ে। তবুও তাঁর মৃত্যুকে যখন খ্রীষ্টের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন সেটা যুক্তি দিয়ে মানা শক্ত হয়ে ওঠে। হিংসা যে হিংসা টেনে আনে—এ সত্য সর্বাবস্থায় অবাঞ্ছিত। সেটা ধর্মের পথ নয়। সে পথ ধার্মিকতার আদিম বর্বরতার পথ।

বর্তমান নব্যহিন্দুধর্মের একটি রাজপথ আপাতত আমাদের চোখের উপর আছে। সেটি রাজপথ হলেও আপেপাশের নানা মত, নানা পথ কোনোটাই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ, হিন্দু সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে না। তার দেবতা সংখ্যায় বাড়ে (সম্প্রতি শনি-শীতলাসহ হাইকোর্টেশ্বরও পাওয়া যাবে)। বারোয়ারি পুজায় চাঁদার উৎপাতে হিন্দু অহিন্দু সকলে সশঙ্কিত—বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহল। ব্যবসায়ী মহলের অসাধুতার উপর কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাঁদের সাজা দেবার পথ বা সংস্কার করার পথও চাঁদা তোলা নয়। আরো দুঃখ আর লজ্জার বিষয় যে, হিন্দু ব্যতীত আর কেউ চাঁদা তুলে উপাসনা করে না। অন্তত এখনও না। পুজার যে শান্ত পরিবেশ, উৎসবের যে প্রীতিকর সম্মেলন, উচ্চনীচ সকল মানুষকে নিয়ে যে প্রসন্নতা—তা আজকের হিন্দুধর্মের উৎকট শব্দদূষণ আর মাইক বাজানোর মধ্যে পাবার উপায় নেই। হিন্দুধর্মের নামে শিলা-পূজা, শিবসেনা, বজরং দল প্রভৃতি হিংস্র উগ্রতার পরিপোষক। মানুষকে জাগিয়ে তোলার নামে আজ কোনো শুভকার্য সম্ভব নয়। অথচ সমগ্র ভারতবর্ষ-ব্যাপী এই বর্বরতার মৃত্যু আমরা চোখের উপর দেখতে বাধ্য হচ্ছি। তিন হাজার বর্ষের পুরাতন হিন্দু সমাজ নদীর মতো সাগরাভিমুখে যাচ্ছে না—যত্রতত্র আবর্ত-ফেনায় ফুঁসে উঠছে হত্যালীলায়। এরই মধ্যে যে রাজপথটির কথা বলছি, সেটি এখনও একটি আলোক-স্তম্ভের মতো জ্বলছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভক্ত নই — সাধারণ মানুষ হিসাবে কমনসেন্স যুক্তিটা আমার কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয়, সহজে বুঝতে পারি এমন মনে হয়। আলোচনার প্রথম দিকে আমি বলেছি ধর্মবোধটার জাগরণ হয়েছে একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক মায়াবরণের মধ্যে। (প্রথম ও দ্বিতীয় চার্ট দ্রষ্টব্য)। সর্বত্র মানুষ বিজ্ঞান বা যুক্তির পথে যেতে পারে না। সকলেও তা পারে না। কাজেই মায়াবরণের ভিতর দিয়ে আরো একটা পথ তৈয়ারি হয়েছে—সেটাই ক্রমে রূপ নিয়েছে সমাজে স্বীকৃত ধর্মের। বহু সৎ মানুষ সেটাকে আশ্রয় করে অবলম্বন বলে গ্রহণ করেছেন। মনস্তত্ত্ববিশারদগণও তাই সেটা সচেতন দায়িত্বে স্বীকার করে নিয়েছেন। আধুনিক বিশ্বে সমাজবাদী দেশগুলি প্রারম্ভিক পর্যায়ে সচেতনভাবে ধর্ম- আর ধর্মনীতি-বিরোধী কিছু আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তাদের ধারণা ছিল—এতে করে তাদের আদর্শের রূপায়ণ ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু কার্যত তা হয় নি। স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীর মনে হয়তো ধর্মবোধ বা ঈশ্বরপ্রসঙ্গের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে; কিন্তু প্রয়োজন যে নেই, সেই বোধটা সচেতনভাবে মানুষ যতক্ষণ উপলব্ধি না করে, ততক্ষণ তার কাছে ধর্ম বা তৎস্থানাপন্ন কিছু চাই। মন্দির-মসজিদ-সিনাগগের মতোই তখন জরুরি হয় নেতার মূর্তি-রচনার অথবা নেতার মরদেহ সংরক্ষণের। এও রাজ-পথ নয়।

ভারতে আপাতত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—এই তিন ধর্মের লোকই বেশি। প্রথমটিই সর্বাপেক্ষা বেশি। এ ছাড়াও কিছু বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসিক, আদিবাসী-ধর্মব্রতী—সংখ্যালঘু হিসাবে বর্তমান। হিন্দুধর্মের মধ্যে আবিলতা আছে ঠিকই, আবার উপরিভাগে স্বচ্ছন্দ স্রোতও আছে। সে স্রোত ধ্বংস করে না, দুই কূল ছুঁয়ে প্রসন্নতা সৃষ্টিও করে। আকাশের নীলিমা—সে জলে প্রতিবিম্বিত হয়। ধর্মের স্থান হিসাবে তীর্থস্থান আছে—তীর্থস্নানও আছে। পাপ-পুণ্যবোধ আর ধর্মাধর্মচেতনাও আছে। সবার উপরে আছে "বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ" মানবকল্যাণব্রত। সব ধর্মেই আর্তত্রাণ আর পরদুঃখ-কাতরতা এবং জীবসেবার ব্যবস্থা আছে। মুসলমানের এতিমখানা আর খ্রীষ্টানদের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ দান করা, মা তেরেজার আর্তসেবাব্রত আমাদের চোখের উপরই দেখছি। এগুলিকে আমি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বলে ভাবি না—সর্বমানবীয় বলেই ভাবি। সেই সঙ্গে সানন্দচিত্তে ভাবতে পারি—নব্যহিন্দুধর্ম আর তার উদ্‌গাতা বিবেকানন্দ স্বামীর আদর্শ এখনও এদেশে লুপ্ত হয় নি। আমরা তাঁদের সঙ্ঘকে নব্যহিন্দুধর্মের পুরোধা বলে মনে করতে পারি। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানকে একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন বলে আখ্যা দেন। কিন্তু স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও এ সঙ্ঘ সহস্র-সহস্র বর্ষের প্রচলিত হিন্দুধর্মের লক্ষণাক্রান্তও হয়ে উঠেছে।

হিন্দুধর্মের যা কিছু সৌষম্য, যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা আর কল্যাণকর কর্মের বিকাশ, অপরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে এক করে দেখা, আর্ত-ভক্তকে সহায়তা দিয়ে সুপথে আনা এমন অনেকগুলি কাজ আছে যা স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত আদর্শ-সহ আরব্ধ কর্মপদ্ধতিতে এই সঙ্ঘ এখন পর্যন্ত সজীব আনন্দে বহন করে চলেছে। স্বদেশ তথা বহির্বিশ্বে তা সমাদৃত হয়েছে ও হচ্ছে। যদি মানবপ্রজাতিকে টিকে থাকতে হয়, তাকে শুভবোধ অর্জন করতে হবে। বিজ্ঞানীর কুশলতার সঙ্গে যদি এই শুভবোধ না যুক্ত হয়, তাহলে তা সামূহিক বিপৎপাতের পূর্বাভাস—আজ আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। হিন্দুধর্মের মধ্যে জীবনশতদলকে বিকশিত করার একটা মহৎ প্রয়াস আমরা বিবেকানন্দ স্বামীর চিন্তা-ভাবনায়, আদর্শে আর কর্মব্রতের মধ্যে অনুসরণ করতে এখনও পারি। ধর্ম হিসাবে হিন্দুধর্ম এখনও দেশে বিদেশে সেই

ঐতিহ্যকে পুনরধিকার করে বিতরণ করতে পারে।

বক্তব্য শেষ করার সময় আবার আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। বৃহৎকে ক্ষুদ্র করে বা ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করে দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। তবুও যদি সে ত্রুটি এ লেখায় ব্যক্ত হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষন্তব্য। জ্ঞানদেবতার উদারতায় আমার সকল ত্রুটি ক্ষালিত হোক—এই আমার প্রার্থনা।

সমাপ্তিরিয়ং শুভায় ভবতু, সুখায় ভবতু, শিবায় ভবতু।

সাহিত্যে মনোবিদ্যার প্রয়োগ

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

বাঙলা গল্প-উপন্যাসের একালের পাঠককুল মনোবিদ্যা বা সাইকোলজি নামটার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নন। গল্পে-উপন্যাসে যতটুকু ঘটে বা চরিত্রগুলি যতটুকু বলে তার চেয়ে তারা যতখানি ভাবে সেটাও পাঠকের নজর এড়ায় না। এই ভাবার ব্যাপারটাই মনস্তত্ত্ব বা মনোবিদ্যার জগৎ। শুধু উচ্চকিত ভাবনাই নয়, মানুষের সুপ্তচেতনা বা অবচেতন মনে যে ভাবনার খবর সহজে বাইরে আসে না, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও মানুষের জীবনকে নানা খাতে টেনে নিয়ে চলে। শুধু গল্প-উপন্যাস কেন, কবিতা-নাটকের পাঠকও এই ব্যাপারটায় যথেষ্ট সচেতন। গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকে যোগেশের পদস্খলন ঘটে বাঙলা ব্যাঙ্কের 'ফেল' পড়ায়, মেজো ভাইয়ের প্রতারণায় এবং ছোটো ভাইয়ের কারাবাসের ফলে। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"তে মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারীর কাহিনীতে এমন কোনো বাইরের ষড়যন্ত্র বা আঘাতের প্রয়োজন হয় নি, তবুও কাহিনীর গতি এবং জটিলতা ব্যাহত হয় নি, উপন্যাসের পাঠকেরও আগ্রহ হারায় নি। বলা হয়, এই "চোখের বালি" দিয়েই বাঙলা উপন্যাসে নতুন যাত্রার সূচনা। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই মনোবিদ্যার প্রসঙ্গ অধিক চর্চিত। কারণ গল্প-উপন্যাস গড়ে ওঠে মুখ্যত মনুষ্যচরিত্রকে অবলম্বন করে। সেই মানুষ বা চরিত্র বিবর্তিত হয় একদিকে বহির্ঘটনাসংঘাতের ফলে, অপরদিকে মনুষ্যপ্রবৃত্তি আর মানসপ্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়ায়। ঘটনাসংঘাতের আবর্তন-পথেও মানসপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা অনুযায়ী চরিত্রের পরিণতির গতিপথ নির্ণীত হয়। আধুনিক মনোবিদ্যা ব্যাপারটার যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ দিয়েছে। তবে মনই যে সকল কর্মের উৎসে, কর্মের নির্ণায়ক একথা ধম্মপদেও বলা হয়েছিল বহুকাল আগে। মানুষের জীবনচর্যায় জটিলতা বেড়েছে, সামাজিক বিচার বা মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে মনোবিদ্যার প্রয়োগের ব্যাপারেও জটিলতা এবং পরিবর্তন ঘটেছে। পুরাণ-মহাকাব্যের যুগে দৈবের অমোঘ প্রভাব বা সমাজনির্দিষ্ট অলঙ্ঘনীয় নীতি-বোধের নিরিখেই যাবতীয় চরিত্রের পরিণতি নির্ণীত হয়েছে। যদিও পুরাণ-মহাকাব্যের কিছু-কিছু ঘটনাকে একালের মনোবিদ্যার নিরিখে ব্যাখ্যা করলে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হতে পারে। কৈকেয়ী যে দশরথকে তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে রামের বনবাস এবং ভরতের অভিষেক প্রার্থনা করেছিলেন, তা নিছক দৈবনির্দিষ্ট ব্যাপার হলে কুব্জা মন্থরার ভূমিকার কী প্রয়োজন ছিল? সতীন-পুত্রের সৌভাগ্যে স্বাভাবিক ঈর্ষাই কৈকেয়ীর প্রার্থনার পিছনে মানব-চিত্তের প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই বলে বাপের আদেশে রামের বনগমন বা সীতার অগ্নিপরীক্ষার পিছনে আধুনিক মনোবিদ্যার কোনো ব্যাখ্যা খাটে না। ওখানে পিতৃসত্যরক্ষাজনিত সমাজনির্দিষ্ট মূল্যবোধ বা প্রজানুরঞ্জন অপিচ নারীর সতীত্ববিচারে সমাজনির্দেশই নিয়ন্ত্রক কারণ। প্রাচীন মহাকাব্যের যাবতীয় ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিদ্যার প্রয়োগ নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, তবে মহাভারতে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রতিপক্ষের মধ্যে আপন আত্মীয়পরিজন দেখে অর্জুন বিষাদে ভেঙে পড়বেন—এ তো নিতান্তই একালের মনোবিদ্যাসম্মত প্রতিক্রিয়া। তবে সারথি

সাহিত্যবিচারে মনোবিদ্যা—রণেন্দ্রনাথ দেব। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩। ১৯৯০। কুড়ি টাকা।

কৃষ্ণ যে একটা আস্ত গীতা শুনিয়ে অর্জুনকে আবার তাঁর বন্ধুক ধরালেন, তার পিছনে মনোবিদ্যার ব্যাপার কতখানি ছিল তা গীতায় বর্ণিত ধর্ম এবং নীতির প্রাধান্যে সংশয় জাগায়। ফলে গীতাটাই টিঁকে থাকে, যুদ্ধটা গৌণ হয়ে পড়ে।

মহাকাব্যের এসব বিশ্লেষণ বিদ্বজ্জন নাও মানতে পারেন, তবে এ প্রসঙ্গ চিন্তায় আসার প্রত্যক্ষ কারণ হল শ্রীরণেন্দ্রনাথ দেবের "সাহিত্যবিচারে মনোবিদ্যা" বইখানি। উপরে যা লেখা হয়েছে তার কোনো কথাই এই দ্বাদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত ১১৮ পৃষ্ঠার বইখানিতে লেখা হয় নি। শ্রীদেব তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় সংযত এবং বিনম্র উক্তিতে গ্রন্থটির জন্মরহস্য বিবৃত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'একদা মনোবিদ্যাবিষয়ক কিছু আলোচনা পড়ে মনে হয়েছিল এর কতগুলি সূত্র সাহিত্যবিচারে প্রযুক্ত হতে পারে। সেই চেষ্টার ফল এই সন্দর্ভ।' তিনি 'বিদগ্ধ মনোবিজ্ঞানী' 'নতুন কোনো আলো' পাবেন আশা করেন নি। সত্যই কোনো নতুন আলোক পাবেন কিনা সে কথা বিদগ্ধ মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। 'সাহিত্যজিজ্ঞাসু পাঠকের চিন্তায় নাড়া' যে তিনি দিতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। বইটির প্রধান সাফল্য সেখানেই।

প্রাজ্ঞ সমালোচকেরা বলেন, 'সুপ্ত অবচেতন প্রেরণা বা এষণা আর সচেতন প্রকৃতির মিলন ও দ্বন্দ্ব পৃথক ব্যাপার।' 'সাহিত্যে সুপ্ত চেতনা এবং মাঝে-মাঝে তাদের অনীপ্সিত কিন্তু অনিবার্য প্রকাশ'-ই মনোবিদ্যার ব্যাপার। বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত উপন্যাসসমূহের কোথাও-কোথাও তার প্রয়োগ সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" তার দৃষ্টান্ত, লবঙ্গলতিকা একটি 'সূক্ষ্ম মনোবিদ্যার অপরূপ প্রকাশ'। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মনোবিদ্যার প্রয়োগ নিয়ে মতান্তর থাকলেও, অনেক আলোচনা হয়েছে। মতৈক্য যে ঘটে নি, তার একটি কারণ মনোবিদ্যা এক অর্বাচীন শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র মন কী বস্তু তার সুস্পষ্ট ধারণা এখনও নির্ণয় করতে পারে নি। পরন্তু মনোবিদ্যার সূত্র 'পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়ন শাস্ত্রের সূত্রগুলির মতো অব্যভিচারী হবে' এরকম আশা করা যায় না। তথাপি সমালোচকে-সমালোচকে মনোবিদ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতান্তর সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর"-এর প্রতাপ-শৈবলিনী, বা "রজনী"-র অমরনাথ-লবঙ্গলতিকা, রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়"-এর অমল-চারু, "চোখের বালি"-র মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী বা শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ"-র সুরেশ-অচলা-মহিম যাঁরা পড়েন তাঁরা আপন-আপন বিদ্যা রুচি বা অভিজ্ঞতার নিরিখে চরিত্রগুলি বিচার করে নেন এবং পাঠক যে খুব ভুল করেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এঁদের উপন্যাসের নতুন পাঠক এখনও আসছেন।

প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের সঙ্গে সর্বাত্মক মতৈক্য না হতে পারে তা মেনেও শ্রীদেব বাঙলা সাহিত্যে মনোবিদ্যা প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন 'বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত' মধুসূদন থেকে। রণেন্দ্রনাথের মতে, 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মনোবিদ্যা-সম্মত মানবচরিত্র' মধুসূদনই আঁকেন, তিনি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন "কৃষ্ণকুমারী নাটক" এবং "বীরাঙ্গনা" কাব্য থেকে। তবে "সোমের প্রতি তারা" পত্রকাব্যের তারা প্রথমাবধি কলুষিত প্রেম সম্পর্কে সচেতন, এই যুক্তিতে 'সুপ্তচেতনা'র প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর এমন তর্ক উঠতে পারে। তবে 'বিবেকের দ্বন্দ্বে পীড়িত' তারার পত্রে যে বিপর্যস্ত অন্তরের বিশ্লেষণ রয়েছে, তাকে মনোবিদ্যার বাইরেই বা রাখা যাবে কীভাবে? কলুষিত প্রেম সম্পর্কে সচেতন তারা তো সমাজ-ধর্মের নির্দেশে পতিদেবতার শিষ্য সোমদেবের প্রতি তাঁর মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখতে পারলেন না। একদিকে সমাজধর্ম আর একদিকে অন্তরের অনিবার্য আবেগ। মনোবিদ্যার বিশ্লেষণেই বোঝা যায় অন্তরের অনিবার্য আবেগ জয়ী হয় কেন। সেই অভিব্যক্তিই স্পষ্ট হয়, 'কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে' এই উক্তির সূত্রে।

ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত প্রতিটি

অধ্যায় যথাক্রমে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে মনোবিদ্যার প্রয়োগ করার প্রয়াস আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে "দুর্গেশনন্দিনী", "কপাল-কুণ্ডলা", "মৃণালিনী", "চন্দ্রশেখর", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "বিষবৃক্ষ", "রজনী", "আনন্দমঠ", "সীতারাম" অর্থাৎ প্রায় সব কটি উপন্যাসই আলোচনাসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতির সাহায্যে একটি সাধারণ সূত্র লেখক খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। পেরেছেন কি পারেন নি সেটা বড়ো কথা নয়, প্রশ্নটিকে স্পষ্ট করেছেন—সেখানেই তাঁর সাফল্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে রণেন্দ্রনাথ কেবল উপন্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবেন না বলে "ডাকঘর" থেকে শুরু করেছেন। "শ্যামা"য় এসে কীভাবে জাতকের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি সূক্ষ্ম হৃদয়দ্বন্দ্বের কাহিনীতে পরিবর্তিত হয়েছে তার আলোচনা করেছেন। "নষ্টনীড়" প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছেনঃ 'চারুর দুঃখ শোকাহত ব্যক্তির দুঃখ, সে একজন প্রেমপাত্র লাভ করেছিল যদিও সে ব্যক্তি তার স্বামী নয়, ভূপতি কোনো দিন প্রেমপাত্র পায় নি, পাবার চেষ্টাও করে নি। ...চারু ও ভূপতির মনোজীবন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কিন্তু সমাজের বিধানে এদের আজীবন দাম্পত্য ধর্মের বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।' কিন্তু চরম মুহূর্তে অমলকে সরিয়ে না দিলে চারু-ভূপতির দাম্পত্য ধর্মের বিশ্বস্ততা রক্ষা করা কতদূর সম্ভব হত, তাও গবেষণার বিষয়। "চোখের বালি" নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রচুর। রণেন্দ্রনাথ সাহস করে বলেছেন, 'বিনোদিনী হচ্ছে এক প্রকার পৌরুষসম্পন্ন নারী।' মনোবিজ্ঞানীদের মতে, 'পৌরুষসম্পন্ন নারী দুর্বল পুরুষের ভক্তি পেয়ে তৃপ্ত হয় না।' সেই কারণেই 'বিনোদিনী কেন মহেন্দ্রকে ত্যাগ করে বিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তা বোঝা দুষ্কর নয়।' রণেন্দ্রনাথের আলোচনায় "ঘরে বাইরে" "শেষের কবিতা"ও স্থান পেয়েছে, কিন্তু "যোগাযোগে"র চরিত্রের উল্লেখ ছাড়া বিস্তারিত আলোচনা কেন অনুপস্থিত বোঝা গেল না। অথচ "শিশু" বা "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের শিশু চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তিনি করেছেন। 'বীরপুরুষ'-এর থোকার কল্পনা 'সিম্পল শিজোফ্রেনিয়া' একথা না জেনেও কিন্তু থোকা পাঠকমাত্রেরই প্রিয় হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এসে রণেন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন তাতে কোনো-কোনো শরৎপ্রেমিক পাঠক বা সমালোচক ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। তিনি বলেছেন, 'সূক্ষ্মভাবে দেখলে মনে হয় শরৎচন্দ্রের আঁকা নারীচরিত্রগুলি প্রায় সবই একই উপাদানে গড়া এবং তিনি এদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য রচনা করার বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন নি।...তাঁর দৃষ্টি মনোবিজ্ঞানীর নয়, সমাজবিজ্ঞানীর।...সেইজন্য শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র ও পতিতচরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা ও বৈচিত্র্য অল্প, একথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।' তা সত্ত্বেও রণেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে তাঁর আলোচনা থেকে একেবারে বাদ দেন নি। "শ্রীকান্ত", "চরিত্রহীন", "দেনাপাওনা" এবং সর্বোপরি "গৃহদাহ" বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ' "চোখের বালি" প্রকাশিত হবার মাত্র পনেরো ষোলো বছরের ভিতরে বাঙলা উপন্যাসে নর-নারীর এমন মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ, জীবনের এমন মূল্য-হীনতা ও শূন্যতাবোধ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, একথা ভাবলে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।' এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রের 'দৃষ্টি মনোবিজ্ঞানীর নয়, সমাজবিজ্ঞানীর' সিদ্ধান্তটি যথার্থ নয় মনে হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তী কালের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংগত কারণে তাঁর আলোচনার অন্তরভুক্ত হয়েছেন। বিশেষত, জগদীশ গুপ্ত বাঙলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচিত লেখক। কিন্তু রণেন্দ্রনাথ তাঁকেও

আলোচনার অন্তরভুক্ত করে এ প্রজন্মের পাঠকের আগ্রহকে জগদীশ গুপ্তের প্রতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। কবিতায় মনোবিদ্যার প্রয়োগের আলোচনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। সেখানে মাত্র একটি অনুচ্ছেদে অমিয় চক্রবর্তী এবং জীবনানন্দ দাশের প্রসঙ্গ এসেছে। কবিতায় মনোবিদ্যার প্রয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা এত সংক্ষেপে সম্পূর্ণ হবার নয়।

প্রথম পাঁচটি অধ্যায় প্রধানত মনোবিদ্যার পরিচয় এবং বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে মনোবিদ্যার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের বক্তব্যের সারাৎসারও। যেহেতু সাহিত্যে মনোবিদ্যার প্রয়োগ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় যথেষ্ট আলোচনা হয় নি, লেখক সেই কারণেই এখান থেকেই তাঁর নিজস্ব আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। বিশেষত গ্রন্থটি প্রকাশকের "জ্ঞানসম্পুট গ্রন্থমালা"র অন্তরভুক্ত। নতুন পাঠককে কোনো বিষয়ে প্রবেশ করাতে গেলে এটাই পদ্ধতি। তবে প্রথমাংশর আলোচনায় যতটা সরলীকরণের প্রয়াস আছে ততটা রসসিক্ত করা যায় নি। হয়তো লেখকের ত্রুটি নয়, বিষয়ের ত্রুটি এবং পরিভাষার বাধা।

সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস-নির্মিতির প্রক্রিয়া

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

"দি কনস্ট্রাকশন অব কমিউনালিজম ইন কলোনিয়াল নর্থ ইনডিয়া" বইয়ের সূচনায় জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে

The Construction of Communalism in Colonial North India. Gyanendra Pandey. Oxford University Press, 1990. Rs. 250·00.

'সাম্প্রদায়িকতা'র ধারণাটি ইতিহাস-নির্মিতির ধারায় ধরতে চেয়েছেন।

কোনো বিশেষ সংজ্ঞার্থে "সাম্প্রদায়িকতা"-কে বেঁধে রাখতে চান নি। লেখকের কথানুযায়ী "সাম্প্রদায়িকতা" বাস্তবে ঔপনিবেশিক জ্ঞানের একটি রূপ। আধুনিক জাতীয়-চেতনা ভারত-উপনিবেশে উন্মেষের প্রাক্কালে উপনিবেশবাদীরা ভারতের নানা ধরনের গোষ্ঠীগুলোকে (যেমন রাজপুত, শিখ, মুসলিম, ভীল) চিহ্নিত করতে রেস, নেশন, ন্যাশনালিটি, ক্লাস ইত্যাদি শব্দরাজির যথেচ্ছ ব্যবহার করত। সম্প্রদায় বা কমিউনিটি শব্দের ব্যবহার এসেছে অনেক পরে। উপনিবেশবাদীদের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় থিওডর মরিসন ১৯৩২-এ লিখলেন :

'হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যের কারণগুলি খুঁজে বার করা অপ্রয়োজনীয়। যা গণ্য করা উচিত তা হল যে তারা বাস্তবিকই নিজেদের আলাদা মানুষ হিসেবে ভাবে এবং অনুভব করে। জাতিসত্তা বিষয়ে সব ধরনের আলোচনায় এটাই একমাত্র মাপকাঠি যা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।..... এই মাপকাঠিতে ভারতের মুসলমানরা একটি জাতি। যেসব সম্প্রদায়গত পার্থক্যের কথা বলা হয় প্রকৃতপক্ষে সেগুলো জাতীয় (ন্যাশনাল) দ্বৈষ মাত্র।' (পৃ ২)

এই দৃষ্টিকোণে সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তাবাদ সমার্থক। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার গুরুত্ব এইজন্যেই যে এটা জাতীয়তাবাদ নয়। বরং জাতীয়তাবাদের বিপরীত এবং প্রধান প্রতিপক্ষ।

সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝতে গেলে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে হবে না। বোঝা দরকার—যুক্তিবাদের যুগে (এবং পুঁজিরও) ভারতের সমাজে যেভাবে উপনিবেশবাদ এবং জাতীয়তাবাদের জন্ম, সেই একই সময়ের ফসল সাম্প্রদায়িকতা। একটি নির্দিষ্ট কালে, একটি নির্দিষ্ট উপনিবেশে এর আবির্ভাব। সুতরাং একমাত্র ভারতের বর্তমান সমাজ এবং রাজনীতির

বিকাশের প্রসারিত ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান এক যথার্থ ধারণা দিতে পারে আমাদের।

সেজন্যেই শ্রীপাণ্ডে সাম্প্রদায়িকতার অনুসন্ধানে সমাজ এবং রাজনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে চেয়েছেন যা মূল সমস্যার বিশ্লেষণে কমবেশি জরুরি। যেমন শহর-গ্রামের শ্রেণীবিশ্লেষণ, জাতপাতের আন্দোলন, বিভিন্ন আন্দোলনে জনসমাবেশের ধরন, উপনিবেশবাদী এবং জাতীয়তাবাদীদের বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ করে নীচু শ্রেণীর জগৎ।

লেখকের উদ্দেশ্য নানা সূত্র ধরে উনিশ এবং বিশের দশকের শুরুতে যাকে "সাম্প্রদায়িক" সংঘর্ষ বলা হয় তার প্রকৃত অবস্থা, চরিত্র এবং ফলাফল অনুধাবন করা। একই সঙ্গে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট নির্মিতির—সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস নির্মিতির ধারায় যা ছোট্টো একটি শব্দে রূপ পেয়েছে অর্থাৎ 'সাম্প্রদায়িকতা'—তার বিচার বিশ্লেষণ করা।

ভারতে সাধারণভাবে "সাম্প্রদায়িকতা" শব্দটি ব্যবহার করা হয় বিভিন্নধর্মীয়সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সন্দেহ, ভয় এবং অবিশ্বাস বোঝাতে। কেতাবি গবেষণায় প্রায়শই সাম্প্রদায়িকতাকে স্বঘোষিত ধর্মীয় স্বার্থ বজায় রাখতে রাজনৈতিক আন্দোলনকে চিহ্নিত করা হয়। যে স্বার্থ অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা আক্রান্ত। সে আক্রমণ কল্পিত কিংবা বাস্তব হতে পারে।

উপনিবেশবাদী এবং জাতীয়তাবাদীদের সাম্প্রদায়িকতার ধারণায় পার্থক্য মৌলিক।

উপনিবেশবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার গায়ে 'একান্ত ভাবেই প্রাচ্য' এই লেবেল তো আগেই এঁটে দিয়েছেন। তাঁরা আরো বলতে চান—যে সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় সমাজের উন্মেষ থেকেই এর এক অন্যতম মূল চরিত্র—এর ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং যুক্তিহীন চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এদেশের মানুষের ইতিহাস ঘটে যায়। ইতিহাসকে কোনো প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকা সচেতন এবং তাৎপর্যপূর্ণ যোগদান—এভাবে ভারত-ইতিহাসকে দেখতে উপনিবেশবাদীরা চান না।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা সাম্প্রদায়িকতাকে উপনিবেশবাদীদের মতো ভারতের প্রায় সমগ্র জনগণের প্রাচীনতম রোগ বলে ভাবেন না। বিপরীতে তাঁদের চিন্তানুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটি হালফিলের। মূলত আর্থিক-রাজনৈতিক অসাম্যের ফল। এবং কিছু উচ্চকোটি মানুষের (উপনিবেশবাদী এবং দেশীয়) উশকানিতেই এই সমস্যাটি এত প্রবল। অথচ দেশের বেশির ভাগ মানুষ যেখানে সেকুলার।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। কিন্তু উপনিবেশবাদীদের 'প্রাচ্যজাতিসমূহের এক আবশ্যিক উপাদানরূপে' (racist-essentialist) সাম্প্রদায়িকতাকে পরিগণিত করার ভেতরও জাতীয়তাবাদীদের চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। অনেক ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পেছনে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন। আবার অন্যদিকে যখন বিষাণ নারায়ণ দার, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কিংবা গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদীরা মন্তব্য করেন হিন্দুদের 'নির্জীবতা' (meekness) কিংবা 'স্বভাব-ভীরুতা' (natural cowardice) অথবা মুসলিমদের 'উগ্র চরিত্র' (bullying nature) তখন কিন্তু তাঁদের ধারণার সঙ্গে উপনিবেশবাদীদের racist-essentialist তত্ত্বের সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে কি উপনিবেশবাদী, কি জাতীয়তাবাদী—উভয়েরই মূল অনুসন্ধান সাম্প্রদায়িকতার কারণসমূহ জানা। তাঁদের বিপরীত অবস্থান এই কারণসমূহের চরিত্রগত পার্থক্যে। উপনিবেশবাদীদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় জনমানসের এক স্বাভাবিক অবস্থান। শ্রীপাণ্ডে এই

মতকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন এসেনসিয়ালিস্ট (essentialist) নামে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ধারণা অনুযায়ী অর্থনৈতিক এবং তার ফল হিসেবে রাজনৈতিক সংঘাতের এক বিকৃত প্রতিফলনই সাম্প্রদায়িকতা। লেখক এই ধারণাকে ইকনোমিস্টিক (economistic) বলেছেন।

এই উভয় ধারণাই কিন্তু বাস্তবত সাম্প্রদায়িকতাকে এক মূর্ত ঘটনা (tangible phenomenon) বলে ধরে নিয়েছে, যার কারণসমূহ স্পষ্ট চিহ্নিত করা যায়। এবং সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে যুক্তিবাদ কিংবা উদারনীতিবাদ অথবা সেকুলারিজম কিংবা জাতীয়তাবাদে উত্তরণও সম্ভব। উভয় ধারণাই ভারতীয় সমাজের এই উত্তরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। উভয়েই মনে করেছে ভারতের পশ্চাৎপদ অংশকে শিক্ষা, রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং আর্থিক বিকাশের সহায়তায় তাদের সাম্প্রদায়িকতার কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত করতে হবে। উভয়ের অবস্থানের মূলভিত্তি উদারনীতিবাদী তত্ত্ব। যার সহযোগী হয় যুক্তিবাদ (rationalism) নয়তো সেকুলারিজম।

১৯৬০-পরবর্তী গবেষণাকর্ম অবশ্য অনেকাংশেই উপনিবেশবাদীদের দৃষ্টিকোণকে খণ্ডন করেছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণেরও অনেক রূপান্তর সাধিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম-শিখ ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি আদি-অন্তকাল থেকেই তাদের সমগ্রতা নিয়ে বিরাজমান—এই মিথ্যে ধারণা আজ ভেঙে দেওয়া গেছে। অঞ্চলভেদে, জাতপাতভেদে (caste), শ্রেণী-ভেদে যে এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যেই নানা বিভিন্নতা বর্তমান তাও লক্ষ করা গেছে। এবং আদিকাল থেকেই ভারতের সমাজের এক স্বাভাবিক রূপ সাম্প্রদায়িকতা, এমন উপনিবেশবাদী তত্ত্বও খণ্ডিত হয়েছে। বরং বিষয়টি ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বের অবদান—যা কিনা জাতীয়তাবাদের সমসাময়িক একটি ধারা, যা অনেকটাই জাতীয়তা-বাদের বিকাশকে রুদ্ধ করেছে। এমন ধারণা সমূলতর হয়েছে।

ভারতের গোষ্ঠীরাজনীতি এবং গোষ্ঠীসংঘাতের অন্তরালে যেসব অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ বর্তমান, সেগুলোকেও খুঁটিয়ে দেখছেন এখনকার গবেষকরা।

১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে যেসব গবেষকগোষ্ঠী আন্দোলন এবং সংঘাতগুলির ইকনমিস্টিক ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট, যাঁরা এইসব সংঘাতের মূলে 'শ্রেণী' কিংবা 'অর্থনৈতিক' সংগ্রামকে দেখে থাকেন তাঁদের ব্যাখ্যাও খুব একটা আশার সঞ্চার করতে পারে না। এত দ্রুত কী করে "শ্রেণী"সংগ্রাম 'সাম্প্রদায়িকতার বেশ' ('communal guise') ধরতে পারে? অথবা কেনইবা 'সাম্প্রদায়িক বৈরিতা' ('communal antagonism') সাধারণ অর্থনৈতিক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ রূপে দেখা দিতে পারে? এর কোনো যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ এসব গবেষণায় পাওয়া যায় না। যদি বলা যায়—ভারতীয় জনতার ব্যাপকতম অংশের (সাধারণ কৃষক, বেকার এবং মধ্যবিত্ত) অত্যধিক ধর্মীয় সংকীর্ণতাই (এবং নির্বুদ্ধিতা) তাদের সাধারণ বিক্ষোভগুলোকে এই পথে ঠেলে দেয় তবে হয়তো একটা উত্তর পাওয়া যায়। অবশ্য সে উত্তর বাস্তবে উপনিবেশবাদীদের এসেনসিয়ালিস্ট তত্ত্বের অনুসারী মাত্র।

ইতিহাস-গবেষণার এইসব অগ্রগতি একটি মূল প্রস্তাবনা নিয়ে কোনো নাড়াচাড়া করে নি, যা উপনিবেশবাদীরা প্রতিষ্ঠা এবং বিকশিত করে গেছে। এবং জাতীয়তাবাদীরাও যেটাকে গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা করে নি। সেটি হল সাম্প্রদায়িকতা এই জ্ঞান-পর্বটিকে (the category of communalism) এবং তার প্রতি যেসব মূল্যবোধ আরোপিত হয়েছে সেগুলিকে অনড় এবং চূড়ান্তরূপে দেখা (fixity and finality)।

একথা সত্যি যে এখনকার অনেক গবেষণাকর্মই প্রাচীন উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকটাই

সরে এসেছে, কিন্তু উদারনৈতিক-উপনিবেশবাদী সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যেই তাদের এখনও ঘোরাফেরা। এবং কীভাবে ইওরোপীয় আদর্শ জাতি-রাষ্ট্রে (nation-state) পরিণত হওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িকতায় পরিবর্ত 'জাতীয়তাবাদ' কিংবা 'সেকুলারিজমে'র প্রতিস্থাপন-প্রচেষ্টা।

আজ অবশ্য এজাতীয় চিন্তার দৈন্য প্রকট। ভারতীয় রাজনীতির ছাত্ররা তাই এই উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত কাঠামোটিকে মানতে চাইছেন না। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানপর্বকে (the imperialism of categories) চ্যালেনজ করতে চাইছেন। যেভাবে তাদের সামনে 'সাম্প্রদায়িকতা', 'সেকুলারিজম' এবং 'জাতীয়তাবাদকে' তুলে ধরা হয়েছে (the given-ness of 'communalism', 'secularism'; and for that matter 'nationalism') তাতে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন।

শ্রীপাণ্ডের পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ভারতীয় অতীতের উপনিবেশবাদী নির্মাণ (The Colonial Construction of the Indian Past)। বস্তুত প্রাক্-উপনিবেশ ভারতে লিখিত ইতিহাস বলতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। উপনিবেশবাদীরাই প্রথম ভারতের অতীত ইতিহাস নির্মাণে প্রবৃত্ত হন।

নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে শ্রীপাণ্ডে দেখাতে চেয়েছেন—এই নির্মাণে উপনিবেশবাদীরা ইতিহাসের স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের উদাসীন। কালনিরপেক্ষভাবে বেনারসের ঘটনা, মোবারকপুরের ঘটনা, শাহাবাদের ঘটনা—সব যেন একসূত্রে গাঁথা। এবং এই কয়েকটি ঘটনাই যেন সমগ্র ভারতের সমাজ-চরিত্রনির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। কী সেই চরিত্র—আদি-অন্তকাল থেকেই এদেশের মানুষের ভেতর সুপ্ত ধর্মোন্মাদনা মাঝে-মাঝেই ভয়াল হিংসায় প্রতিফলিত হয়। দাঙ্গা বাধে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কালনিরপেক্ষভাবে, স্থান-নিরপেক্ষভাবে সব দাঙ্গারই চরিত্র এক—উন্মত্ত, গোষ্ঠীতান্ত্রিক (clannish) জন-গোষ্ঠীর সম্মিলিত হিংসার প্রকাশ। ভারতীয় জনতা বিশৃঙ্খল, বিশেষ কিছু সম্প্রদায় যারা 'ডাকাতি করতে, দাঙ্গা বাধাতে' সদা তৎপর। 'ধর্মবিদ্বেষের আগুন' অসংখ্য অভ্যন্তরীণ কলহ—এইসবই ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একের পর এক বিবরণের যে ইতিহাস, বস্তুত তা কোনো দেশ বা সমাজের ইতিহাস নয়। তা রাষ্ট্রের ইতিহাস। এই প্রাচ্য-দেশীয়, দাঙ্গাপ্রবণ, ধর্মান্ধ অশিক্ষিত মানুষজনের নিরন্তর মারামারি, কলহে নিরপেক্ষ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেন তার নৈতিক শক্তির জোরেই এদেশের মানুষকে রক্ষা করেছে; তাদের ভেতর শুভ চিন্তার উদয় ঘটিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় "গোঁড়া জোলা" (The bigoted Julah)। ঔপনিবেশিক ইতিহাস-নির্মিতির ধারায় ঔপনিবেশিক সমাজতত্ত্বের অবদান—ভারতীয় সমাজকে এক বিশিষ্ট চোখে দেখা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজের মূল-একক রূপে (basic unit) দেখা হত গ্রাম-সম্প্রদায়গুলোকে (village community)। পরের দিকে উপনিবেশ-বাদী সমাজতত্ত্বে গ্রাম-সম্প্রদায়কে বদলে তার জায়গা নিয়েছে জাতপাত (caste)। সমাজের মূল-একক জাত ধরে এরপর উপনিবেশবাদী সমাজতত্ত্বে জাত-পাতের অনুপুঙ্খ বিবরণ নথিভুক্ত করা হতে থাকে ১৮৪০-পরবর্তী সময় থেকে।

তাঁদের বর্ণনায় জাতপাতও এক চূড়ান্ত এবং অনড় রূপ পেয়েছে। জাত ধরে-ধরে, তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা, ঐতিহ্যবাহী পেশা, তাদের দক্ষতা, অলসতা—এসবের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। এমনকী কোন্ জাত কতটা অপরাধপ্রবণ, কতটা সমরকুশলী, কে কত সত্যপরায়ণ, অথবা মামলাবাজ কিংবা বিদ্রোহী—এসবও তালিকাভুক্ত করতে উপনিবেশ-বাদী সমাজতাত্ত্বিকরা দ্বিধা করেন নি।

চতুর্বর্ণপ্রথা থেকে উদ্ভূত ভারতের বিভিন্ন সমাজে এই জাতপ্রথাকে ঐতিহাসিক কালানুক্রমে, সামাজিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে, আঞ্চলিক নির্দিষ্টতায় সন্ধান করতে পারলে তবেই জাতপ্রথার বর্তমান জটিল কাঠামোকে কিয়ৎপরিমাণে অনুধাবন করা সম্ভব। কিন্তু উপনিবেশবাদীরা কখনই সে পথ মাড়ান নি। কারণ, প্রথমত 'পশ্চাৎপদ প্রাচ্যদেশীয়দে' অগ্রবর্তী সভ্যতার আলোকপ্রদানই তো তাঁদের মহান কাজ! এবং সেক্ষেত্রে, এই নানা জাতের ভেতর যেসব দোষগুণের সন্ধান তাঁরা করেছেন তা তাঁদের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরো দৃঢ়মূল করতে।

আর এই প্রক্রিয়াতেই ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি 'অনুগত গোর্খা' (loyal Gorkhas) কিংবা অপরাধী (criminal) উপজাতি (tribes) রামোশিস, ঠগ (Thugs) কিংবা গোষ্ঠীতান্ত্রিক (clannish), গোঁড়া (bigoted) এবং 'হিংস্র-বিশৃঙ্খল' (turbulent) জোলা (Julaha)—এইভাবে ভারতীয় সমাজ ধরা পড়ে ঔপনিবেশিক সমাজতাত্ত্বিকদের চোখে।

শ্রীপাণ্ডে এইসব ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়েছেন 'গোঁড়া জোলা' এই ধারণার বিশদ বিশ্লেষণ করে। প্রথমত, উত্তর ভারতের এই মুসলিম তাঁতি-সম্প্রদায়কে জড়িয়ে যেসব সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছেন, তৎকালীন প্রশাসন তাঁদের বিভিন্ন নথিতে এবং পরবর্তী নানা উপনিবেশবাদী রচনায় এবং যার ওপর দাঁড়িয়েই মুসলিম তাঁতি-সম্প্রদায়ের ওপর 'গোঁড়া' লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছে চিরকালের জন্যে; শ্রীপাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় সরকারি নথি অনুযায়ীই এঁদের 'গোঁড়া' বা 'হিংস্র' আখ্যা দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, কেবল সংঘর্ষকালীন আচরণের ভিত্তিতে (যা আবার যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ নয় বরং অনেকাংশেই আরোপিত, মনগড়া) উত্তর-ভারতীয় এই মুসলিম তাঁতি-সম্প্রদায়ের (জোলা) এমনতর অনড় গুণ-বৈশিষ্ট্য (fixed quality) খুঁজে বের করা শুধু যে অতিসরলীকরণ তাই নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও বটে।

শ্রীপাণ্ডে দেখাতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিক শিল্পের (বিদেশী-দেশী) আঘাতে বিপর্যস্ত জোলা-সম্প্রদায়ের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থান। একের পর এক তাঁত বন্ধ। কেউ রুজির টানে কলকাতার কাপড়-কলে। কেউ সাতপুরুষের পেশা ছেড়ে চাষবাসে। কেউ-বা চা-বাগানে। এসব যাদের জোটে নি, তারা পথে নেমেছে ভিক্ষাপাত্র হাতে। তাঁতি-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন। এমন একটা অবস্থায় আত্মপরিচয়-রক্ষার প্রয়াসে ঘরে-ঘরে 'তাঁতযন্ত্রকে' সচল রাখার তাগিদে, তাঁদের নিজের-নিজের মহল্লায় ধর্মীয়-স্বাতন্ত্র্যের ভেতর খুঁজেছেন অস্তিত্বের পুনর্বাসন। এই ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যও বৈশিষ্ট্যহীন নয়। ঔপনিবেশিক শাসনে আর্থিক সুবিধাভোগী 'বিছুক কালোয়ার' কিংবা 'রিথাই সাউ' যখন তাদের প্রাধান্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে ধর্মকেই প্রধান অবলম্বন করে, প্রধানত তাঁতি-মহল্লায় জবরদস্তি মন্দির তৈরি করতে চায়, তখন 'বিছুক' বা 'রিথাই'-র ওপর ক্ষোভ ফেটে পড়ে মন্দির-নির্মাণকে উপলক্ষ করে। পরিণতিতে ক্রোধানলে পুড়ে মরে 'বিছুক'-'রিথাইরা'।

শ্রীপাণ্ডের ধারণায় প্রাক-আধুনিক সমাজে ধর্মকে অন্য কোনো কিছুর পরিবর্ত-প্রকাশ রূপে দেখাটা ঠিক নয়। 'ধর্ম' কালনিরপেক্ষভাবে এক জায়গায় স্থির থাকে না। ধর্ম অপরিবর্তনীয়ও নয়। ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মের নতুন-নতুন দিক গুরুত্ব পায়; নতুন সব সমস্যাকেন্দ্র-বিন্দুতে উঠে আসে; 'ধর্মরক্ষা' এক অন্যতর অর্থ বহন করে।

ঔপনিবেশিক জমানার বিপরীতে সমাজে যে এক নতুন ধরনের আলোড়ন ওঠে, নতুন-নতুন বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয় তা যতটা না 'ধর্মকে' কেন্দ্র করে তার থেকে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে আশ্রয় করে ধর্মেরই একটি প্রতিষ্ঠান জাতপাতকে। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে ব্যাঙের ছাতার মতো

গজিয়ে-উঠতে-থাকা নানা জাতপাতের সংগঠন এবং তাদের আন্দোলন এর উদাহরণ। প্রত্যেকেই তাদের জাতের স্বকীয়তা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তৎপর। আহির (গোয়ালা), সৎনামী (চামার), লোধি, কুর্মি এবং জোলা ইত্যাদি অসংখ্য জাতপাতের আন্দোলন একদিকে যেমন তাদের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে, অন্যদিকে তেমনি বেগারি, নীচু জাতের নারীদের প্রতি উঁচু জাতের অমর্যাদা প্রকাশের বিরুদ্ধে এক শক্তি রূপে কাজ করে।

এই ধরনের আন্দোলনে বলা যায় রাজনীতি ধর্মের রূপ নিয়েছে। 'সংস্কৃতায়ন' (Sanskritization) বা 'ইসলামীকরণ' (Islamization) প্রকৃত অর্থে স্বতন্ত্র পরিচয়ের, অধিকার দাবি করার এবং আত্মসম্মান বজায় রাখার উপায় হিসেবেই কাজ করেছে।

বুর্জোয়া আদর্শ যখন ক্রমাগতই ইতিহাসের উপাদানগুলোর এক রূপ-সারাৎসারে (essential types) দেখাতে চাইছে, বুর্জোয়া উপনিবেশবাদ এই একই কাজ করেছে একশো গুণ বেশি উৎসাহে। এইসব 'মিথ' (myth) বা রূপ-সারাৎসার (essential type) যে শুধু বাস্তবকে বিকৃত করে তাই নয়, বিকৃতকরণের ধরনটা হল এগুলো থেকে ইতিহাসকে বাইরে টেনে আনা। সমাজের ইতিহাস বলতে আর কিছু থাকে না, থেকে যায় কিছু সুন্দর কিংবা কুৎসিত বিষয়—যার কোনো ঐতিহাসিক উন্মেষ কিংবা বিলয় নেই। যা শাশ্বতকালই বিরাজমান। এইভাবেই উপনিবেশবাদী সমাজতত্ত্বে নির্মিত হয় 'গোঁড়া জোলা', 'ভয়ংকর পাঠান', 'কুচুটে বামুন', 'হিংস্র আহির' কিংবা 'অপরাধী পাসি'-র মিথ।

সেজন্যেই দেখা যায়, উপনিবেশবাদী সমাজতত্ত্বে জাতপাত নিছক ভারতীয় সমাজের মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয় এককরূপেই চিহ্নিত হয় না। এগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট প্রবৃত্তি, ঝোঁক, আকাঙ্ক্ষা-আগ্রাসন, মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা ইত্যাদির (যা অবশ্যই অতীত ঐতিহ্যবাহী) প্রকাশও দেখা যায়। জাত-পাতের এইসব বৈশিষ্ট্য আবার অনড়, অপরিবর্তনীয় এবং নিয়ন্ত্রণহীন। জাতপাতের এসব ধর্ম কিংবা আবেগ থেকে পুষ্টি পায় সাম্প্রদায়িকতা। জন্ম দেয় এমন এক সমাজ-সংস্কৃতির যা একাধারে যুক্তিহীন, সংকীর্ণ, মতান্ধ এবং হিংস্র। এসব কিছুর মূলে কাজ করে যাচ্ছে অযৌক্তিক আদিম ধর্মীয় গোঁড়ামি (religiosity)। উপনিবেশবাদীদের ভাষায় জাত-পাত যদি ভারতীয় সমাজের একক হয় তবে সাম্প্রদায়িকতা তার সংস্কৃতি।

এইভাবেই ঔপনিবেশিক সমাজতত্ত্বে জাতপাত (caste) সমাজ-সংস্কৃতির (আরো সঠিক অর্থে সমাজ-প্রকৃতির) গভীরে ঢুকে পড়ে। সাধারণ মানুষের ইতিহাস বিলুপ্ত করে উপনিবেশবাদী সমাজতত্ত্বও রাষ্ট্রের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করে। যেখান থেকে ঠিক হয় ভবিষ্যতে ভারতে ব্রিটিশ কর্তব্য।

'সম্প্রদায় যেখানে নিজেই ইতিহাস' (Community as History), 'হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাবেশ' (Mobilizing the Hindu Community) এবং 'হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান' শীর্ষক অধ্যায়গুলোতে কীভাবে ঔপনিবেশিক ভারতে নানা সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে, বিশেষ করে 'হিন্দু' সম্প্রদায়ের, তার কিছু বিবরণ রেখেছেন।

উপনিবেশবাদী ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব কিন্তু ভারতের আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলোর এবং তাদের ইতিহাসের চিহ্নকে মুছে দিতে পারে নি। সম্প্রদায়-গুলো—রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে যে ভারতীয় সমাজ তা টিকে ছিল এবং গতিশীল, লক্ষ্যাভিমুখী, এবং যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি হিসাবে উপনিবেশিক ভারতে স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছিল।

ঔপনিবেশিক আক্রমণই ভারত-ইতিহাসের প্রথম সংকটকাল নয়। অতীতেও অনেক সংকট এসেছে। জমি, বাজার এবং অন্যান্য সম্পদ-উৎসের দখলদারি নিয়ে বড়ো-বড়ো রাজনৈতিক সংগ্রাম ঘটেছে।

আগ্রাসী সেনা এবং দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কেবল নয়; আঞ্চলিক স্তরেও। নতুন পেশাগত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। নতুন-নতুন জাতপাত দেখা দিয়েছে। কখনও বহুগুণ বেড়ে গেছে জাতপাতের সংখ্যা। কখনও তারা এক হয়েছে, আবার আলাদা হয়ে গেছে। 'প্রাচীন', 'মধ্য' এবং 'আধুনিক' ভারতের ইতিহাস নানা ধর্মীয় বিকাশে—নতুন ধর্মচেতনায়, নতুন আন্দোলনে, নতুন উদ্ভমে পরিপূর্ণ।

পুঁজিবাদ সারা বিশ্বকে নিছক একটি বাজারে পরিণত করতে চায়। আধুনিক উপনিবেশবাদ পুঁজিবাদের আগ্রাসী বাহুরূপে বাজারের প্রয়োজনেই সর্বত্র এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করে। যেখানে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রশক্তির কাছে আর কারো কোনো স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকতে পারবে না।

কিন্তু দেশীয় সমাজ প্রতি স্তরেই উপনিবেশবাদীদের এই চেষ্টাকে প্রতিহত করতে চেয়েছে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বয়ংক্রিয় নিজস্ব একটি পরিপূর্ণ সত্তার, এক কথায় সম্প্রদায়ের সমগ্রতার অন্বেষণ করেছে। সব মিলিয়ে একটি সমগ্র সত্তার অন্বেষণ অর্থাৎ 'সম্প্রদায়' নানা রূপ পেয়েছে। কখনও তা আঞ্চলিকতায় কিংবা জাতিধারণায়, কখনও-বা দেশব্যাপী ধর্মীয় মৈত্রী-বন্ধনে, কখনও জাতপাতের রূপে বা অন্য কোনো এলাকাগত বিশিষ্ট ঐক্যসূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে আমরা দেখি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের 'অগ্রওয়াল' জাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রচেষ্টা। আবার অন্যদিকে কুর্মি, চামার, দুনিয়া ইত্যাদি অচ্ছুত জাতপাতের নিজস্ব 'ইতিহাস' (পুরাণ, কিংবদন্তি ইত্যাদির সাহায্যে) রচনা প্রয়াস; যে ইতিহাস অনুযায়ী তারা সমাজে জাতে উঠতে চায়। তাদের সামাজিক সত্তার যে অমর্যাদা চলছে তাকে অস্বীকার করে নতুনতর এক মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক সত্তার স্বীকৃতি চায়।

আর সেজন্যেই ভারত-ইতিহাসের সামাজিক সত্যের অনুসন্ধানে এইসব জাতপাত বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ইতিহাস অনুধাবন প্রয়োজন। শ্রীপাণ্ডে এ-ধরনের দুটি বিবরণ : ১. শেখ মহম্মদ আলি হাসান-রচিত ওয়াকিত-ও-হাদেসাত : কসবা মোবারকপুর (Waqeat-o-Hadesat : Qasba Mubarakpur) এবং ২. আবদুল মজিদের 'ডায়রি' (মোবারকপুরের একজন তাঁতি)। বিশ্লেষণ করে মোবারকপুর এলাকার তাঁতি-সম্প্রদায়ের সমাজ-ইতিহাসের কিছু সত্য এবং উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সামাজিক সত্তাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস উন্মোচন করেছেন।

সম্প্রদায়ের সত্তা, তার অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'ইতিহাসের' এই ব্যবহার আবার অন্য সম্প্রদায় কখনও মেনে নেয় নি। ফলে খোদ ইতিহাসই সম্প্রদায়গুলোর ভেতর বিবাদের ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হয়েছে।

ইতিহাস নিয়ে বিবাদ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসে—উচ্চকোটির (superordinate) মানুষরা যে 'ইতিহাস' তাদের ইতিহাস বলে প্রতিপন্ন করতে চান সে ইতিহাসে নিম্নকোটির (subordinate) মানুষের ভাগীদারত্ব স্বীকার করতে চান না। 'কী করে এই হীন মানুষগুলো তাদের স্বয়ং নির্ভরতা বা আত্মমর্যাদা দাবি করার মতো স্পর্ধা দেখাতে পারে?' এলাকাগত আঞ্চলিক স্তরেও উচ্চকোটির মানুষরা নিম্নকোটির মানুষের জীবন ও ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চান। কিন্তু সমাজ আলোড়নে তাঁরা যে নিম্নকোটির মানুষের এমন প্রতিরোধের সামনে পড়বেন, এ ভাবনা তাঁরা কল্পনাতেও আনতে পারেন নি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাবেশ (Mobilizing the Hindu Community) অধ্যায়ে শ্রীপাণ্ডে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে একদিকে স্বর্ণযুগের ইতিহাস (The golden age) আবার অন্যদিকে দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শে উদ্ভূত গোরক্ষা আন্দোলন, যা একই সঙ্গে

বর্ণহিন্দুদের মদত পেয়েছে আবার নীচু জাত আহির কুর্মি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নিজস্বসত্তা রক্ষার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ক্রমে-ক্রমে ব্যপ্তি পেয়ে এই আন্দোলন এক প্রসারিত হিন্দু-সম্প্রদায়-মানসের বিকাশ ঘটাতে পেরেছে।

কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে শ্রীপাণ্ডে লক্ষ করেছেন এই হিন্দু স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে সাধারণভাবে অচ্ছুত জাতপাতের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। অবশ্য, এ থেকে এমন একটা ধারণা করা ঠিক হবে না যে হিন্দু (অথবা মুসলিম) স্বার্থ কিংবা ধারণা, সংখ্যাগরিষ্ঠ নীচু জাতের কাছে কোনো অর্থই বহন করে না। বরং 'জাতি' এবং 'বেরাদরি' মনোভাব থেকে এঁরা অনেক সময়েই উচ্চকোটির স্ব-সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় যোগ দিয়েছেন।

বাস্তবত, উনিশ শতক পর্যন্ত, সাধারণ মানুষের সমস্ত কাজকর্মের ভিত ছিল তাদের জাতপাত, গোষ্ঠী। এখান থেকেই তারা যেভাবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়েছে সেগুলোই 'হিন্দু' কিংবা 'মুসলিম' সম্প্রদায় এইরকম ধারণার (concept) উদ্ভবের কারণ। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায় ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় জনগোষ্ঠীগুলির 'হিন্দু' এবং 'মুসলিম' সম্প্রদায়ে এই যে বিভাজনপ্রক্রিয়া তা সর্বত্র সুস্পষ্ট সরাসরি বৈরিতার রূপ পায় নি। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ১৯১০-২০-তে বিহারে কইরি, কুর্মি, আহিররা সংগঠিত হচ্ছিল তাদের উচ্চস্তরের সঙ্গে সমতাপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির দাবিতে, তখন স্থানীয় বর্ণহিন্দু জমিদাররা অভিজাত মুসলিম জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই দুর্বিনীত নীচু জাতদের দমন করার জন্যে সবরকমের হিংসাত্মক বলপ্রয়োগ, ধর্ষণ কোনো কিছু করতে কসুর করে নি। বলা যায়, ১৯৪০ পর্যন্ত অন্তত, গ্রাম্য রাজনীতিতে উচ্চ এবং নিম্নকোটির জাতপাতের সংঘর্ষ, স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম বিরোধ থেকে অনেক বেশি তীব্র ছিল।

পরবর্তী 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' অধ্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষপর্বের জটিলতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন লেখক। বেইলি (Bayly) মতো অনেক গবেষকই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ছিচারী বলেছেন। একদিকে মোতিলাল নেহরুর মতো সেকুলার, আবার অন্যদিকে মদনমোহন মালব্যের মতো 'হিন্দু'—উভয়ই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিস্থানীয়। জাতীয়তাবাদের উন্মেষকালের এই বহিঃপ্রকাশ বাস্তবিক তার অভ্যন্তরীণ বিচিত্র চরিত্র এবং নানা বিপরীতধর্মী উৎসকেই চিহ্নিত করে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বস্তুত ভারতীয় সমাজেই নিহিত। সর্বত্রই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্প্রদায়ের এক নিবিড় যোগ আছে। তা জার্মানদের 'বিশুদ্ধ' আর্যজাতি অথবা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদি সম্প্রদায়, কিংবা ভারতের নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়, যাই হোক না কেন। একদিকে জাতীয়তাবাদের রূপ আধুনিক, তার প্রকাশ যুক্তিনির্ভর, ব্যক্তির অধিকার, সমতা এবং আকাঙ্ক্ষিত পথে ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণ। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ রক্ত এবং হিংসায়, ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায়, প্রাচীন ঐতিহ্যের সুরক্ষায়—যা বাস্তবত সাম্প্রদায়িক প্রকাশ, ব্যক্তির যুক্তিবাদী মানসের নয়।

লেখকের ধারণায় ১৯২০-৩০ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারণায় সাম্প্রদায়িক প্রকাশই ছিল প্রধান। ভারতীয় জাতি বলতে হিন্দু+মুসলিম+খ্রীষ্টান+পারসি+শিখ ইত্যাদিদের এক সমন্বিত রূপ (composite) বোঝানো হত। পরবর্তী সময় থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি-ধারণা ভারতীয় শিক্ষিতমহলে প্রবল হতে থাকে এবং এই দুই ধারণার মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়তে থাকে। এর ফলেই আর-একটি নির্দিষ্ট ধারণায় রূপান্তরিত হতে থাকে। 'সাম্প্রদায়িকতা' ধারণাটি পূর্ণ রূপ পায়।

ফলে, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই কংগ্রেস একই

সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি-ধারণার এবং সাম্প্রদায়িক জাতি-ধারণার (প্রধানত হিন্দু) মঞ্চ। যেখানে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মানসের প্রকাশ অনেক বলিষ্ঠ। আজকে যে 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' বি. জে. পি.-র ব্যাটল্ ক্রাই (যুদ্ধ-ঘোষণা) তার উদ্‌গাতা কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদের অন্যতম পথিকৃৎ মদন-মোহন মালব্য। যিনি এলাহাবাদে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগ হিন্দু সমাজ, সনাতন ধর্মসভা, সর্ব ভারতীয় হিন্দু মহাসভা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর মূলমন্ত্রকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেও তাঁর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন।

শেষ অধ্যায় 'জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্প্রদায়িকতা' (Nationalism versus communalism)। শ্রীপাণ্ডে লক্ষ করেছেন ১৯২০-৩০ নাগাদ আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যা সাম্প্রদায়িক চেতনার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, যা হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ভারতীয় জনতাকে জাতীয়তাবাদের প্রধান শক্তি রূপে দেখতে চেয়েছে। যে চেতনার কাছে ভারতীয় মানুষের দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষার অবসান মূল ভবিষ্যৎ লক্ষ্য রূপে সূচিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের এই আধুনিক ধারণা ধর্মীয় চেতনাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছে। ধর্মাচরণের নতুন নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছে। ধর্ম হবে ব্যক্তিগত। রাজনীতি এবং ধর্মের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকা চলবে না। ইত্যাদি।

অন্যদিকে ভারতীয়ত্বর (Indianess) ওপর গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে ভারত-ইতিহাসকে ফের নতুন দৃষ্টিতে হাজির করার প্রয়োজনে 'বিবিধের মাঝে মহান' ধরনের চিন্তা নব্য জাতীয়তাবাদীদের মূল মন্ত্র হয়ে উঠল। অশোক, আকবর প্রমুখ ভারতীয় সম্রাটরা ইতিহাসে চিহ্নিত হতে লাগলেন 'মহান ঐক্য আনয়নকারী' (the great unifier) রূপে।

লাজপত রায়, গান্ধী প্রমুখ ধর্মের আবশ্যক (essential) এবং অনাবশ্যক দিক সম্পর্কে অবহিত করতে চাইলেন ভারতীয় জনতাকে। বস্তুত, এই আধুনিক জাতীয়তাবাদী চিন্তা একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদের সূচনাপর্বের বৈশিষ্ট্যগুলোকে এক-কথায় খারিজ করে দিয়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে তার প্রধান প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে দিল অন্য-দিকে উপনিবেশবাদী ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব যেমন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সমাজের উন্মোচনে সাধারণ জনতার ইতিহাসকে কোনো আমল না দিয়ে জনতার আদিমতা, বর্বরতার উদ্ধারকর্তারূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল; সেই একই প্রক্রিয়ায় 'ভারত ঐক্যসূত্রে গাঁথা' এই ধারণার ইতিহাস-নির্মিতির প্রক্রিয়ায় নব্য জাতীয়তাবাদীরাও ভারতীয় জনতার বহুমুখী ইতিহাসকে অস্বীকার করে, নিজেদের (জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ শিক্ষিত সমাজ) জনতার ত্রাতা রূপে প্রতিপন্ন করতে চাইল।

আর, এখানেই বাধল সংঘাত। কেননা, এতদিন জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত ছিল নানা সম্প্রদায়ের বিকাশের চেতনা। এই দুই চেতনার পারস্পরিক সংঘাত এবং মিলমিশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কখনই একটা সুস্পষ্ট রূপ দিতে পারে নি। গান্ধীর চারমাসের মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী উক্তি এই জটিলতার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে : "The brave (Ali) Brothers are staunch lovers of their country, but they are Mussulmans first and every-thing else afterwards. It must be so with every religiously-minded man"

24th Sept, 1921.

"Nationalism is greater than sec-tarianism. And in that sense we are Indian first and Hindus, Mussulmans, Parsis, Christians after".

26th Jan., 1922

(পৃ 233)

নব্য জাতীয়তাবাদী চেতনার অভ্যন্তরে আবার সম্প্রদায়গত চেতনার সমাপতনও লক্ষ করা যায়। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিও হিন্দু অধিকার রক্ষায় শামিল হন। কিংবা নব্যদের পরিভাষায় স্থান পেয়ে যায় 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম' (Nationalist Muslim) শব্দটি। অর্থাৎ বিপরীতে নিশ্চিতভাবেই আছে 'সাম্প্রদায়িক মুসলিম'। হিন্দুদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কোনো অভিধা আরোপিত হয় না, যেহেতু নব্য জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাঁকিয়ে বসে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়গত চেতনা।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপটি সুস্পষ্ট না হওয়ার ফলেই ১৯৪৭-পরবর্তী ৪০ বছর পরও আবার নতুন করে ধর্মীয় রীতিনীতি সুরক্ষা, প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-স্থানের পবিত্রতা রক্ষা, সর্বোপরি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার দাবি আজ ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বিমুখী জটিল বিকাশের এক অবশ্যম্ভাবী ফল রূপেই আজ আবার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেতনার এই ঊর্ধ্বগতি।

নব্য জাতীয়তাবাদীদের সংশয়ী উচ্চারণে এবং প্রস্তাবনাতেও নিহিত ছিল এর উৎস। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিপক্ষ করে নির্বাচনে নেমে নেহরু উৎসাহিত হয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আজাদকে লেখেন :

'I have found an extraordinarily favourable response from the Muslim masses ··I was surprised to find how popular the Congress was among the Muslim peasantry.'

একই সময়ে কৃষ্ণ মেননকেও লেখেন : 'As a rule city Muslims are for the League, ···that the Momins (chiefly the weaver class) and the Muslim peasantry are far more for the Congress···'.

কিন্তু একই লেখায় নেহরুর সংশয় স্পষ্ট হয়, যখন তিনি বলেন : 'An unknown factor, how-ever, creeps in when God and the Koran are used for election purposes.' পৃ. 245.

এই 'unknown factor'-কে তাঁরা কখনই ধরতে পারেন নি বা চান নি।

নব্য জাতীয়তাবাদীদের চিন্তার মিশ্রণও প্রকট ১৯৩১-এ কংগ্রেস কানপুর রায়ট এনকোয়ারি কমিটির কিছু সুপারিশে। রিপোর্ট একজায়গায় ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তাব প্রসঙ্গে যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তা কার্যত "to rejuvenate the cast system as 'a system of real social organisation' (*sic.*) by returning to the four-fold division of 'men of knowledge', of action, of (economic) acquisitiveness and of labour." (p 259).

জাতি সম্পর্কে ধারণার এই বহুরূপতা থেকে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের রূপ নির্মাণে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণাগুলোর মধ্যে সংঘাত চলবেই। নতুন ধারণার অন্বেষণ চলতেই থাকবে।

শ্রীপাণ্ডের নানা দিক থেকে মূল্যবান এই গ্রন্থটি পড়তে-পড়তে দু-একটি প্রশ্ন আসে। তিনি গ্রন্থের বহু জায়গাতেই 'সাম্প্রদায়িকতা' ধারণাটির উৎসরূপে ঔপনিবেশিক কালকে চিহ্নিত করেছেন। একথাও বলেছেন যেভাবে এবং যে সময়ে আমরা উপনিবেশবাদ এবং জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ধারণা অর্জন করেছি, একই প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতা ধারণাটিরও উদ্ভব। অথচ কোথাও সুস্পষ্ট করেন নি : Communa-lism primarily falls within the category of politics। এ-কারণেই সাম্প্রদায়িক চেতনার

ইতিনেতির সরাসরি বিভাজনও দেখাতে তিনি ইতস্তত করেছেন। ফলে, কোথাও-কোথাও তাঁর নিজেরই বিশ্লেষণ মূল প্রস্তাবনার স্ববিরোধী হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, 'জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্প্রদায়িকতা' অধ্যায়টি গ্রন্থ জুড়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে খুবই সংক্ষিপ্ত আকার পেয়েছে। নব্য জাতীয়তাবাদী এবং উপনিবেশবাদীদের জন-ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষার মিল তিনি দেখিয়েছেন বটে কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিরাষ্ট্র (nation-state) ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত সেকুলার ধারণাটি ভারতের ঔপনিবেশিক কালের সম্প্রদায়গত চেতনার (যা আবার জাতিধারণা বিকাশে এক উপাদান রূপে কাজ করেছে) ওপর আদৌ আরোপিত হতে পারে কি না, তা নিয়ে কোনো আলোচনা রাখেন নি। এবং ভারতের যেসব স্থানীয়, ধর্মীয়, জাতপাতগত জনগোষ্ঠীর সচল ইতিহাসকে তিনি ভারতীয় সমাজের প্রকৃত ইতিহাস-রূপে পরিগণিত করতে চেয়েছেন, সেই প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতের এখনকার ধর্মীয় দাবিসমূহ, যা সম্প্রদায়, জাতি, রাষ্ট্র সবটা জুড়ে আছে এবং বিপরীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে যে অস্পষ্ট জটিলরূপ বর্তমান, এই উভয়ের সংঘাত কোনো ভবিষ্যৎ রূপ পেতে পারে তার কোনো সম্ভাব্য বিশ্লেষণ রাখেন নি। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ—যারা নানা জাতপাতে, এলাকা-গত স্বতন্ত্রতায়, ধর্মের স্বকীয়তায় এখনও বিরাজমান, এই সংঘাতে তাদের বর্তমান ভূমিকাটা কী, ভবিষ্যতেই বা কী রূপ নিতে পারে সে বিষয়ে লেখক নিরুত্তর।

এই কয়েকটি প্রশ্ন ব্যতিরেকে সমসাময়িক কালে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে শ্রীপাণ্ডের বইটি নিঃসন্দেহে চিন্তা-উদ্রেককারী (thought provoking) একই সঙ্গে গ্রন্থটি ভারতীয় সমাজের জটিল অগ্রগাতর ধারায় এই বিশেষ সমস্যাটির নিরসনকল্পে নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা পরবর্তী গবেষক-সত্যান্বেষীদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে।

গ্রন্থটির পরিশিষ্টে ১৯১৭-র হিন্দু গো-রক্ষা আন্দোলনে যে সব পাতিয়া (patia) বা ধর্মপত্রর (প্রচারপত্র—circulating letter) নমুনা এবং ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের ১৯৮৪-র বক্তৃতার সংকলন গ্রন্থটিতে মূল্যবান সংযোজন।

কৃষক আন্দোলন, কৃষিসমস্যা

সুজিৎ ঘোষ

প্রাক-দেশবিভাগ বঙ্গদেশে নানা আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে তেভাগা আন্দোলন ব্যাপকতায় আর গুরুত্বে বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। 'নীল বিদ্রোহের' মতো তেভাগার আন্দোলন মূলত কৃষকের সংগ্রাম, কিন্তু তেভাগা "বিদ্রোহ" আখ্যা লাভ করে নি। অথচ, ব্যাপকতায় আর গুরুত্বে তেভাগা আন্দোলন পূর্ববর্তী বহু কৃষক আন্দোলনের চেয়ে দীর্ঘ-স্থায়ী আর বিস্তৃত ছিল।

সুনীল সেন তেভাগা আন্দোলনের কর্মী আর নেতা ছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি পথিকৃৎ গ্রন্থ; তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালকে তেভাগা আন্দোলনের কালপর্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। সূচনা নিয়ে বিতর্ক না থাকলেও তাঁর পরে অন্যান্য অনেক তেভাগা ঐতিহাসিক ১৯৪৯ পর্যন্ত কালকে তেভাগার প্রান্তসীমা বলে মনে করেছেন। সুনীল সেনের বইটিও তেভাগার তেইশ বছর পরে এবং ইংরেজিতে লেখা। বদরুদ্দিন উমর পূর্ব রাঙলার ভাষা আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে

তরাই ডুয়ার্সে শ্রমিক কৃষক বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন। ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত। প্রতিভাস। পনেরো টাকা।

Landlessness in Bangladesh—Nasir-Uddin Ahmad. University Press Ltd, Dhaka, Tk 100.

তেভাগা আন্দোলনের বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। গত কয়েক বছরে তেভাগার ওপর আলোচনা আর তেভাগা সম্পর্কিত রচনাসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সি. পি. আই. থেকে বেরোয় "তেভাগা রজতজয়ন্তী" নামক পুস্তক। পিটার কাসটারস ইংরেজিতে তেভাগা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা নিয়ে বই লিখেছেন,—তাঁর সিদ্ধান্তগুলি অতিসরলীকৃত মনে হতে পারে। এড্রিয়েন কুপারও তাঁর বইটিতে তেভাগা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী "বর্তিক" পত্রিকায় সংগ্রহ করেছিলেন তেভাগার বহু সংগ্রামীর স্মৃতিকথা। কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের "তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস" এখনও বাঙলায় পূর্ণাঙ্গ সুলিখিত একমাত্র গ্রন্থ। তা ছাড়াও, দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল গবেষণা করেছেন। বাংলাদেশ কৃষক সমিতি "তেভাগা সংগ্রাম" নামে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, তাতে বহুজনের স্মৃতিকথার সঙ্গে "এক্ষণে" প্রকাশিত শিল্পী সোমনাথ হোড়ের "তেভাগার ডায়েরি" রচনাটিও অন্তরভুক্ত।

ধনঞ্জয় রায় অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন নিয়ে গত কয়েক বছরে প্রশংসনীয় কয়েকটি স্মৃতিকথাসংকলন প্রকাশ করলেন—যথা-ক্রমে "উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন" (১৯৮৪), "রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন" (১৯৮৬) এবং শেষতম "তরাই ডুয়ার্সের শ্রমিক কৃষক বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন" (১৯৮৮)। যদিও ঘটনার বহুবছর পরে এগুলি লেখা, কিন্তু প্রতিটি রচনাই যোগদানকারী সক্রিয় কর্মীদের লেখা। কার্যত, এগুলি সংগ্রামী মানুষগুলির জবান-বন্দি। তাই, পরবর্তী আরও ব্যাপক গবেষণার পক্ষে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য উপাদান। একই অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের স্মৃতিচিত্র বলে ঘটনা, ব্যক্তি ও বিষয়ের বারে-বারেই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু, এর ফলে বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কেও ক্রশরেফারেন্সে যাচাই করে নেওয়ার সুবিধা। ধনঞ্জয় রায়ের প্রথম বইটিতে কোনো লেখক-কর্মী-পরিচিতি ছিল না, দ্বিতীয় গ্রন্থের সম্পাদনায় কর্মী-পরিচিতির তালিকা যুক্ত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক-ও কর্মী-তালিকাও যুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে শচীন দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী, হরপ্রসাদ ঘোষ, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, অবনী তলাপাত্র, সমর গাঙ্গুলী, ও বিমল দাশগুপ্ত—এই সাতজনের স্মৃতিকথা সংকলিত হয়েছে। আন্দোলনের বিস্তার, জঙ্গিপনা, আত্মত্যাগ —তরাই-ডুয়ার্সের তেভাগা আন্দোলনের এই দিক-গুলির পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের বহু মানুষের দু-একটি টুকরো জিজ্ঞাসার উত্তরও এ গ্রন্থে মিলে যেতে পারে। যেমন, প্রয়াত চারু মজুমদার যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সুযোগে হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা নেতা ছিলেন না, দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গে কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়তা ছিল তাঁর—এ গ্রন্থের একাধিক লেখক সে পরিচয় রেখেছেন। এখন অনেকের মুখে প্রশ্ন শুনি, শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু ১৯৪৪ সালে বিলেত থেকে ফিরে কিভাবে রেল-শ্রমিকদের নেতা হয়ে গেলেন? বিমল দাশগুপ্তর লেখাটিতে সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে: 'প্রসঙ্গত জানাই মাননীয় জ্যোতি বসু যিনি এই ইউনিয়নের পরে জেনারেল সেক্রেটারি হন, তিনি বিলেত থেকে ফিরে প্রথমে কাঁচরাপাড়াকে কেন্দ্র করে বি. এ. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে একটি রেল শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন ১৯৪৪ সালে। সেই ইউনিয়নের স্বীকৃতি ছিল না। কমিউনিস্ট ইউনিয়ন বলে রিকগনিশন পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আমরা দোমহনীতে বি. এ. রেলবোর্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ভেতর থেকে নানা-ভাবে সংগঠিত করে জ্যোতিবাবুর ওই ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত করেছিলাম। এ কাজ করার জন্যে বহু প্রচেষ্টা ও আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে এবং জ্যোতিবাবুকেও অনেকবার তিস্তা ভেঙে দোমহনীতে আসতে হয়েছে। দুটি ইউনিয়ন সংযুক্তির পর দোম-

ইনীর বি. এ. রেলবোর্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নাম থেকে যায় এবং জ্যোতিবাবুর ইউনিয়নের নাম তুলে দেওয়া হয়। সংযুক্তির পর বাংলা-আসাম জুড়ে বিরাট রেল-শ্রমিক ইউনিয়ন রেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। সংযুক্তির পর এই ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হন জ্যোতি বসু এবং জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি বীরেন দাশগুপ্ত, সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জি।' (পৃ ৭০-৭১)। গণসংগঠন ভেঙে নয়, বরং ঐক্য-সংযুক্তির ওপরেই তৈরি হয়েছিল জ্যোতি বসুর রাজ-নৈতিক গণভিত্তি।

আলোচ্য অঞ্চলের সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: '১৯৪৬-৪৭ সালে চা-শ্রমিকদের আন্দোলন আরো জোরদার হয়। এই সময় রেল-শ্রমিক, চা-শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য গড়ে ওঠে এবং কৃষকের তেভাগার দাবিতে হাজারে-হাজারে মিছিল করে গ্রামে বড়ো-বড়ো জোতদারের খেলানে তেভাগা করে (পৃ ৬৮)।' লেনিনের কাঙ্ক্ষিত শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত ভ্রূণাকার বিকাশ এখানে পরিণতি লাভ করল।

কিন্তু সমকালে উপমহাদেশে অন্যতম সংকটে তেভাগার সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হল, এই আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, যেখানে-যেখানে সাম্প্রদায়িকতার চেষ্টা হয়েছিল, তেভাগা তা রুখে দিয়েছিল। এবং তেভাগা যেখানে হয়েছে, সাম্প্রদায়িক হানাহানির সমস্ত চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। এ বইয়ের আরো পাঠক বৃদ্ধি পাবে আশা করি।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি কৃষিসমস্যার অতীত ইতিহাস নয়। এ গ্রন্থের আলোচ্য বর্তমান বাংলাদেশের কৃষি-সমস্যায় ভূমিহীনদের অবস্থান। গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে নাসিরউদ্দিন আহমেদ প্রথমে বাংলাদেশের ভূমি-হীনতার ঐতিহাসিক উৎস সন্ধান করেছেন। কেননা, জমিতে যারা উৎপাদন করছে এবং সামাজিক উৎপান-সম্পর্ক—এই দুটি দিকই ভূমিহীনতার হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিচার্য। যদিও, বাংলাদেশের ভূমিহীনতাই আলোচ্য, উপমহাদেশের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি যেহেতু অখণ্ড, আজকের বাংলাদেশের ভূমিহীনদের সমস্যার সঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সাদৃশ্যও চোখে পড়বে, এবং ভারত-পাকিস্তানেরও নানা উল্লেখ প্রসঙ্গত লেখক এনেছেন। এই বিশ্লেষণে প্রধানত তিনি অন্যান্য গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা-দলিল ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন, সরকারি বক্তব্যেরও বিচার করেছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু, স্বল্প-দৈর্ঘ্য বইটিতে বাংলাদেশে ভূমি-হীনতার ব্যাপকতা ও ক্রমাগত ভূমিহীন কৃষকের জীবনযাত্রার মান অবনয়নের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালে যেখানে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১৫·৩ শতাংশ, ১৯৬১ সালে তা ১৭·৫ শতাংশে পৌঁছয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কৃষি-উপাদানগুলির দামও বেড়ে চলায় সমস্যা জটিলতর হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের জন্যে কিন্তু শস্যের অজন্মা দায়ী নয়, সরকারি ধান-সংগ্রহনীতিই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। কেননা, ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলা-দেশে অতি-ভালো ফসল (bumper crop) ফলে-ছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে জোতদার-মজুতদারদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকলে, বা অন্যভাবে বললে, রাষ্ট্র জোতদার-মজুতদারের দ্বারা পরিচালিত না হলে কোনো অতি-ফলনের বছরে দুর্ভিক্ষ হতে পারে না। এবং দুর্ভিক্ষ হলে ভূমিহীন কৃষকই সবচেয়ে আগে মার খায়। মহাজনি শোষণও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক এবং বহুক্ষেত্রেই সুদের হার শতকরা ১৫০ শতাংশ (পৃ ২৩)। সরকারিভাবে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের সমস্যাগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সরকারি স্বীকৃতির মানে সমাধানের আন্তরিক ও সর্বাত্মক প্রয়াস নয়। তা বহুক্ষেত্রেই কাগজে-কলমে থেকে যায়।

১৯৮৬ সালের হিসাবে ১০১·৭২ মিলিয়ন মোট জনসংখ্যার ৮৬ মিলিয়নই গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। সেখানে আয়ের সবচেয়ে বড়ো উৎস জমি। কিন্তু সেখানে মানুষের মধ্যে আয়ের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এই বৈষম্য না কমে আরো বেড়ে চলেছে। যদিও নানা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প চালু হওয়ায় চাকরির সুযোগ বেড়েছে। কিন্তু গ্রামের গরিবদের একটা বড়ো অংশ লঙ্গরখানার দ্বারস্থ হচ্ছে। এদের মধ্যে কৃষিশ্রমিক আর ছোটো কৃষকরাও রয়েছে। মালিক-কৃষকদের তুলনায় কৃষিকশ্রমিদের আরো দরিদ্র হবার আধিক্য তিনগুণ। সাধারণত ছোটো জমির কৃষকদের ছোটো প্লটের উৎপাদন-ব্যয়ের একক বেশি, 'সবুজ বিপ্লবে'র হাতছানিতে, ছোটো কৃষকরা আরো বেশি করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, আবাদযোগ্য জমির ৪৫ ভাগই বন্ধকে বাধা পড়েছে। সবুজ বিপ্লব অল্পসংখ্যক বড়ো ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে লাভজনক হলেও, তা সামগ্রিকভাবে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীনতার সমস্যা বৃদ্ধি করেছে।

প্রচলিত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই লেখক কতকগুলি সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র রচনা করেছেন। সেগুলি আরো আলোচনা এবং চিন্তাভাবনার সুযোগ এনে দেয়, কিন্তু অনেকেই সমাধানগুলির সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন।

শেষে দুটি বক্তব্য। এক: লেখক বলেছেন 'এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।' ('Bangladesh became independent through a protracted civil war,' p 20) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি 'দীর্ঘস্থায়ী'? এ যুদ্ধ কি 'গৃহযুদ্ধ'?—আমার তা মনে হয় না। গৃহযুদ্ধ স্বাধীনতার জন্যে হয় না, সরকার বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য হয়।

দুই: কার্যত ৯৮ পৃষ্ঠা (পৃ ৯-১০৭) বইয়ের দাম ১০০ টাকা। শুধুই কি বিদেশী ক্রেতার কথা ভেবে বই লেখা হবে? ছাপার ভুল অজস্র।

স্ত্রীবুদ্ধি! মতামতের মন্তাজে নিছকই ছায়াচ্ছন্নতা

দেবব্রত ঘোষ

মামুলি একটা গল্প নিয়েই শুরু করা যাক।

রবিবার। সকাল-সকালই হাজির হলাম বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুগিন্নির বিশেষ নিমন্ত্রণ। আজ নাকি টিভির মহাভারতে পাঞ্চালী ভয়ংকর একটা বোকামি করে ফেলেছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকে তাঁর পিতার অন্ধত্বের রেফারেন্সে কিছু অপ্রিয় কথা কয়েছে। তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল। ব্যস—আর যায় কোথায়! ফস করে সিগারেট ধরিয়ে বন্ধু আমার মন্তব্য করলেন—'মেয়েদের বুদ্ধি!'

ফোঁস করে উঠল সদ্য-কলেজে-ভর্তি-হওয়া বন্ধু-কন্যা—'তার মানে?'

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমার বন্ধু তাঁর আপন কন্যার উত্তেজনা জরিপ করে, যদ্দূর মনে পড়ে আরও একবার সিগারেটে টান দিয়ে এবং তা বাবদ ধূম্র গলাধঃকরণ ও নির্গমন যথাযথ সেরে অবশেষে বললেন—'মানে, দেখা গেছে মেয়েদের বুদ্ধি সাধারণত কম হয়।'

'কে দেখেছে শুনি—তুমি?' দরজার চৌকাঠে আলগা ঠেস দিয়ে বন্ধুজায়ার খোলাখুলি চ্যালেনজ।

বিশ্ব-মাতব্বরের মতো একগাল হেসে টু দি পয়েনট উত্তর দিল বন্ধু—'যদি বলি খোদ ডারউইন সাহেব। যদি বলি গাদা-গাদা সায়েন্স রিপোর্টস তাই বলছে।' আমার বন্ধু প্রাণরসায়নের মাস্টার-মশাই।

* * *

অতঃপর প্লেটো কহিলেন—'যদি একজন পুরুষ শুদ্ধ জীবন-যাপন করে, যদি সে পাশব প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে—তাহলে পরজন্মে সে নক্ষত্র হবে। আর যদি সে তা না করে তবে সে পরজন্মে নারী হবে। আর খারাপ নারীদের আত্মা পরজন্মে পশুর মধ্যে স্থান পাবে।' প্রশ্ন উঠিল—'তাহলে স্যু (Sue)-র কী হবে?' বিশপ হার্ডিকে অমোঘ পথ বাতলাইয়া দিলেন, 'বাপুহে, তোমার ওই Jude the Obscure নামের বিকৃত রুচির বইটি পুড়িয়েই ফেলো।' অন্যত্র, দ্রৌপদীকেও চালান করা হয় নরকে। অথচ, Republic-এ প্লেটো বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিযোগিতায় নারীর সমানাধিকারের কথাও বলেছেন। পাশাপাশি 'নারী হল সেই পুষ্পপাত্র মাত্র যা পুরুষবীজকে গ্রহণ করে। আর শুক্র যা উৎপন্ন হয় পুরুষের মগজ থেকে সেই নির্ধারিত করে জাতকের শারীরিক ও মানসিক অবয়ব। নারী তা ধারণ করে মাত্র।' এসব কথা অবশ্য খুঁজলে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সূত্রমালাতেও পাওয়া যাবে। অথবা তার থেকেও ভয়ানক কথা—woman as temptress, vessel of iniquity', অর্থাৎ নারী নরকের দ্বার। বাস্তবিক এমন একটা ধারণা আছে যে প্লেটোর ধ্যানধারণা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বিশেষভাবে।

যাইহোক সে যেই বলে থাকুন—ওইসব আজ আর বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এইসব কথার মধ্যে গভীর বিজ্ঞান খুঁজতে গেলে পণ্ডশ্রমই হবে। কিন্তু, একটা বিষয় লক্ষণীয়। স্ত্রী-জাতিকে খাটো করে দেখবার 'পুরুষোচিত' ঝোঁকটা নয়-নয় করেও বহুত কালের হল।

* * *

আমার বন্ধু ডারউইনের দোহাই দিয়েছেন। ডারউইন আসবেন। কিন্তু অন্য আরেক জনের কথা মনে আসছে। একজন স্কটিশ জীববিজ্ঞানী। গেদ্দেস। স্যার প্যাট্রিক গেদ্দেস (১৮৫৪-১৯২৩)। তিনি মনে করতেন যে নারী আর পুরুষের পার্থক্য একেবারে মূল কোষ থেকে শুরু হয়েছে। কোষগত নারীত্ব (cellular femaleness) অবস্থান করছে নারীকোষের শক্তি-সঞ্চয়ের সক্ষমতার উপর। অন্যদিকে পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্য হল শক্তিব্যাপন। এইভাবেই তিনি ব্যাখ্যা দিলেন—ক্ষুধার্ত, প্রাণচঞ্চল, সপুচ্ছ শুক্রাণুর এবং পুষ্টিভারা-ক্রান্ত, অচঞ্চল ডিম্বাণুর। অর্থাৎ, পুরুষের চলমানতা, উদ্যম। নারীর শান্তসঞ্চয়, স্থিতি ও প্রতীক্ষা। যথার্থই চমকপ্রদ বললেন উপসংহারে—'যা নির্ধারিত হয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসিক প্রোটোজোয়ার মধ্যে, তোমরা পার্লামেনটি কানুন করে তা হটিয়ে দেবে—বললেই হল!'

আমাদের কৌতূহল যেহেতু নারীর মস্তিষ্কের সক্ষমতা নিয়ে, গেদ্দেসের 'বিজ্ঞান' আমাদের কোনো কাজে আসবে না। গেদ্দেস শুধুমাত্র ডার-উইনি ধারণাকে বৈজ্ঞানিক শব্দভাণ্ডারে সাজিয়ে চকচকে করে একটা ব্যাপক গ্রাহ্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত গেদ্দেসের নর-নারী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হল মেকি-বিজ্ঞান যা বস্তুমুখী অভিনিবেশ ও উপসংহারের শ্রম ব্যতিরেকেই একটা ভাবনাকে আপাত বস্তুমুখীনতার খোলস পরায়। যা কার্যত বিজ্ঞানেরই শত্রু।

* * *

গেদ্দেস ছিলেন টি. এইচ. হাক্সলের ছাত্র এবং খুব সম্ভবত এই ধারণাটা তিনি পেয়েছিলেন চার্লস ডারউইনের লেখা থেকে। স্ত্রী-পুরুষের যৌনদ্বিরূপ (sexual dimorphism) নিয়ে ডারউইন (১৮০৯-৮২) খুব কৌতূহলী ছিলেন। বিস্তর ভেবেছেন এবং কার্যকরী, মূল্যবান কথাও কিছু বলেছেন। অনেক কথা বলার ফাঁকে তিনি শেষমেশ স্ত্রী-পুরুষের বুদ্ধি-বৃত্তিগত তারতম্যের সংবেদনশীল ও উত্তেজক প্রশ্নটিতেও এসে পড়েছেন। তাঁর মতে—এই পার্থক্য অতি পরিষ্কার। গভীর চিন্তা, যুক্তি, কল্পনা, অনুভবক্ষমতা বা ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ—সব কিছুতেই পুরুষের সক্ষমতা বেশি। মোদ্দা কথা—পুরুষের মগজে সার বেশি আছে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই ধরা যাক না কেন—গান-কবিতা, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন—সর্বত্রই পুরুষের জয়জয়কার। একটা যদি অমন তালিকা বানানো যায় পাশাপাশি নারী ও পুরুষ প্রতিভাধরদের, তবে স্পষ্টই বোঝা যাবে এই কথাটা। ডারউইন সাহেব এমনটাই বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন—প্রতিভা বেশি মাত্রায় পুরুষদের মধ্যে বিকশিত হয় যে প্রতিভার জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র গভীর ধৈর্য ও অধ্যবসায় নয়, দরকার মৌলিক কল্পনাবোধ ও যুক্তি-প্রয়োগক্ষমতা। এসব পুরুষজাতির মধ্যে প্রকট এবং তা যৌন-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আহৃত। মানসিক সক্ষমতার গুণাবলী বা বিশেষত্ব সন্তানের মধ্যে বাহিত হয়। মোটামুটি এই হল ডারউইনি ধারণা এ-প্রসঙ্গে।

মনে রাখা দরকার এইসব কথা ডারউইন বলেছিলেন আজ থেকে একশ বছরেরও আগে। যে ডারউইন একজন উচ্চমধ্যবিত্ত, ভিক্টোরিয়ান ভাবনায় লালিত এবং বলেছেন এমন একটা সময়ে, এমন একটা সামাজিক অবস্থান থেকে যেখানে তাঁর সামাজিক স্ব-শ্রেণীতে

ড. দেবব্রত ঘোষের জন্ম ১৯৫৭ সালে কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিওলজিতে এম-এসসি ডিগ্রি লাভের পর তিনি পিএইচ. ডি. করেন দিল্লির অল ইনডিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স থেকে। বর্তমানেও তিনি ফিজিওলজি বা শারীরবিদ্যা নিয়েই গবেষণায় লিপ্ত।

পুরুষের আধিপত্য অত্যন্ত তীব্র। ভাবতে অবাক লাগে —ডারউইনের মতো জাঁদরেল বিজ্ঞানীও মানবিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন করে সামাজিক টানা-পোড়েনে বিভ্রান্ত হয়ে যান! ভুলে যান—পুরুষ-প্রধান সমাজ ও সংস্কারে নারীদের অনিবার্য সামাজিক সীমাবদ্ধতার গুরুত্বপূর্ণ কথাটি! একইভাবে প্লেটো তাঁর সামাজিক অবস্থান থেকে নর-নারীর সক্ষমতার প্রশ্নটি দেখেছিলেন। বিত্তবান অভিজাত প্লেটো মনে করতেন প্রজ্ঞার পূর্বশর্ত হল অবকাশ, এবং সমাজ-সংসার-সংস্কৃতি চলবে একটা স্থির ভাবগত ছকে যেখানে বংশানুক্রমিকতাই নিয়ামক। ডারউইনের ভাবনায় অর্জিত মানবিক গুণাবলী যৌননির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়, বিকশিত হয় ও স্থিতি পায়; এবং পুরুষদের সুযোগ এই প্রক্রিয়ায় অধিকতর নির্ধারিত। প্লেটোর ভাষায়—এ জন্মের সুকৃতি অপর জন্মে বর্তায়; নিম্নগামী পুরুষেরা পরজন্মে নারী হবে, নিম্নগামী নারীদের আত্মা পশুতে স্থান পাবে। আর সুকৃত পুরুষেরা আকাশে তারা হয়ে বিরাজ করবে—অর্থাৎ অবকাশ ও গরিমাময় অবস্থান। শারীরিক মৃত্যুর পরেও আত্মার সজীবতা প্রায় সমস্ত ধর্ম ও দর্শনের একটা বিশেষ বিষয়। সম্ভবত এর মৌলিক উপাদান হল প্রাণের একটি অতি জরুরি চাহিদা—বেঁচে থাকা। আত্মকেন্দ্রিক দর্শনে তাই পুনর্জন্ম। ডারউইন-তত্ত্বে প্রজননভিত্তিক আত্মবিকাশ। এবং দুজনের ভাবনাতেই পুরুষপ্রাধান্যের সামাজিক ছাপটি থেকেই গেছে। বাস্তবিক—প্লেটো উল্লিখিত চারটি গুণের (রিপাবলিক-এ)—প্রজ্ঞা, সাহস, ধৈর্য ও ন্যায়—অধিকাংশই অধিকতর বেশি মাত্রায় পুরুষদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ডারউইন।

মনে হয়, এই অধ্যায়ে ডারউইন যেন প্লেটোনিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নতুবা, তিনি তো দেখেছেন এমন একটা সময় যখন লনডনের মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ দেহোপজীবিনী। তাই নিয়ে রসালো বাণিজ্য-প্রবন্ধ লেখা হয় গেজেটে, পত্রিকায়। জনগণ কেচ্ছা পড়তে ভালোবাসে। সাহিত্যে-শিল্পে মন্দা। ক্রমাগত তীব্রমুখী শ্রেণীবৈষম্য। আর কার্লাইল ঘোষণা করলেন—'পুরুষদিগের দৈহিক পবিত্রতা এখন কবরস্থ।' সহজেই অনুমেয় সেই ব্যাপক নীতিহীনতার সময়ে নারীদের কী নগণ্য স্থান ছিল। এরই মধ্যে যে গুটিকতক শিল্পী-সাহিত্যিক নানাভাবে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখ খুলে দেখলে নজরে পড়বেই শীর্ষস্থানীয়া কিছু মহিলা লেখক-সাহিত্যিকের উজ্জ্বল উপস্থিতি। গাসকেল, এমিলি ও চারলটি ব্রনটি, চারলটি ইয়ং এবং মারীঅ্যান ইজমস্ (জর্জ ইলিয়ট)। হার্ডি লিখলেন 'জুড্ দ্য অবস্কিয়র' (১৮৯৫)—ভিক্টোরীয় যুগের বেদনাক্লান্ত মানুষের গল্প। তাতে, আধুনিকা স্যু শুধুই আত্মসচেতনা নয়, সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারিণীও। ত্যক্ত স্বামীর মুখে স্টুয়ার্ট মিলের উক্তি শুনে যে পরিষ্কার বলতে পারে—What do I care for J. S. Mill! I only want to lead a quiet life। এঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, হৃদ্‌বৃত্তি-বুদ্ধিবৃত্তি এবং দ্বিধা-দোদুল্যমানতার হাত ধরেই নতুন যুগের উন্মেষ। এসবের পরে মনে হয়—নারীর বুদ্ধি-বৃত্তি ও মানসিক সক্ষমতার উপর ডারউইনি অনাস্থা কার্যত অযথাযথ। সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রেজার হ্যারিসন তাঁর "ডার্ক এনজেল: অ্যাসপেক্টস অব ভিক্টোরিয়ান সেক্সুয়ালিটি" (১৯৭৭) বইতে। ডারউইনের নরনারীর সক্ষমতার মূল্যায়নকে বাস্তবে লক্ষ-লক্ষ নারী প্রতিদিন মিথ্যা প্রমাণ করে চলছিল। তারা হল শ্রমিকশ্রেণীর নারীরা। বড়ো-বড়ো শহর-তলিতে এরা অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে গেছে যেভাবে তা একমাত্র আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের লড়াইয়ের সঙ্গেই তুলনীয়। 'শহরে ব্যবস্থাপনা শ্রমিকশ্রেণীর নারীদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিল সাহস, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা প্রভৃতি গুণাবলী যা ডারউইন পুরুষের বিশেষত্ব বলে আরোপ করেছেন।'

* * *

কোনো-কোনো মনস্তত্ত্ববিদ বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient) পরীক্ষায় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে—মেয়েদের মধ্যে ভাষাগত ও সামাজিক দক্ষতা এবং ছেলেদের মধ্যে কারিগরি দক্ষতা বেশি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখার আছে। প্রথমত এজাতীয় পার্থক্য বাস্তবিকই যদি থাকে, তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণ হয় যে 'বুদ্ধিশীলতার স্বাভাবিক প্রবণতায় যৌনদ্বিরূপ' রয়েছে। এটাও একটা খুব বড়ো কথা এবং গোটা সিদ্ধান্তটাই দাঁড়িয়ে আছে আগের প্রকল্পটির উপর। যে প্রকল্পটির সত্যাসত্য এখনও পর্যন্ত অনির্ধারিত। তা সত্ত্বেও, যদি ধরেই নেওয়া যায়—এটা সত্যি, তাহলেও প্রমাণ হয় না মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধিশীলতা স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের তুলনায় কম। কেননা, পার্থক্যটা অভিমুখীনতার। দ্বিতীয়ত—বুদ্ধ্যঙ্ক বা আই. কিউ. বিচার কোনো গভীর বুদ্ধিবৃত্তির হিসাব দেয় না। যা দেয়, তা হল 'বুদ্ধিশীলতার মানসিক স্তর' সম্পর্কে একটা ধারণা। আর এই 'মানসিক স্তর' বস্তুটি শিক্ষা-সমাজ-অর্থ-নীতি ও আরো নানান আপেক্ষিক শর্ত ও কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে, বুদ্ধ্যঙ্ক-পরীক্ষায় ছুটি মানবগোষ্ঠীর উপলব্ধি-অবধারণ বা সৃজনী ক্ষমতার তুলনা করতে যাওয়া একটি গুরুতর ভ্রান্তি। অধ্যাপক গ্রেগোরি তাই পরিষ্কার বলেছেন, আগাম বলতে যাওয়ার মতো আমরা কিছুই জানি না যে ছেলেদের বুদ্ধিশীলতা মেয়েদের থেকে বেশি, না কম, না সমান।

* * *

এক সময়ে ব্রোশ দেখিয়েছিলেন—অদক্ষ শ্রমিকের মস্তিষ্কের ওজন দক্ষ শ্রমিকের মস্তিষ্কের তুলনায় ৫৫ গ্রাম কম হয়। আর নারী ও পুরুষের মগজের ওজনে প্রায় অনুরূপ পার্থক্য—পুরুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ভারী। এসব হিসাবের বিশেষ কোনো শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব নেই। কেননা, একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে মানুষের মগজের ওজনে খুব বেশি রকমের তারতম্য দেখা যায়। ফলে, ওইসব হিসাব পুনরাবৃত্ত পরীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থিত হয় নি। তার চেয়েও বড়ো কথা—নিরঙ্কুশ মগজের ওজনের কোনো মানে নেই। পূর্ণাঙ্গ তিমির মগজের ওজন ৯০০০ গ্রাম, যেখানে মানুষের গড়পরতা ১৩৩০ গ্রাম। তাই মস্তিষ্কের ওজনকে দেহের ওজন বা উচ্চতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাতেও অবশ্য সব সময়ে 'সুবিধা' হয় না। যেমন—মানুষের মস্তিষ্কের ওজন দেহভরের মোটামুটি ১/৪০ ভাগ, সেখানে অপেক্ষাকৃত ছোটো স্তন্যপায়ী মারমোসেট বানরের ১/২০ ভাগ—অর্থাৎ মানুষের থেকে বেশি। আসলে এজাতীয় হিসাবের তেমন কোনো গভীর তাৎপর্য নেই বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধিশীলতার বিচারে। কেননা, এতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন উপাদানের বিন্যাসগত বিশেষত্বকেই হিসাবে আনা হয় নি। অথচ সেইটেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; মন-বুদ্ধি-একাগ্রতার কাঠামো সেখানেই নিহিত।

বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে এটাই মনে হয় যে নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। ব্যাপারটা অন্তভাবে বলা যায়। নারী ও পুরুষের যৌনদ্বিরূপ অনেকগুলি স্তরে নির্ধারিত হয়। একটি চূড়ান্ত স্তর হল মস্তিষ্ক। ফলে আচরণগত পার্থক্য গড়ে ওঠে শুধু তাই নয়, অনেক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেও পার্থক্য দেখা যায়। যেসবের উদাহরণ বা ব্যাখ্যা এখানে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু যেটা প্রয়োজনীয় কথা তা হল—এই পার্থক্যগুলি প্রাথমিক স্তরের এবং সেইসব মস্তিষ্ককেন্দ্র ও উপাদান-সমূহ যুক্তিবৃত্তি, ধীশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে আদৌ কোনো কাজ করে কিনা, সেইটেই প্রশ্ন। খুব সরলীকৃত হলেও বোধহয় একথা বলা যায় যে অবধারণ, ধীশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তি মস্তিষ্কের সবচেয়ে উন্নত অংশ—নিও কর্টেক্সে নির্ধারিত হয়। সেখানে সত্যিই নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা—তা জানা নেই। সাধারণভাবে বলা যায় মানব নারী ও

পুরুষের, মন মানসিক কাঠামো ও ক্ষমতা এবং যে-সবের উপাদানগত বিন্যাসের মধ্যে (পার্থক্য যদি কিছু থেকেও থাকে তার তুলনায়) মিল অনেক গভীর। খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও একটি ঘটনার কথা মনে পড়েছে। জনৈকা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী একদা একটি জনপ্রিয় পত্রিকার সাক্ষাৎকারে ভারতীয় নারীর সৌন্দর্যের অন্বেষণ করতে গিয়ে বিশেষ নৃত্যমুদ্রায় কোমরে কটি ভাঁজ পড়ে তার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয়া গৌরী আইয়ুব পরে একটি পত্রে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—কোমরের ভাঁজ নয়, মস্তিষ্কের ধূসর বস্তু—তার ভাঁজেই নান্দনিকতার উন্মেষ ও অনুভূতি ঘটে। সেই হল নিওকর্টেক্স। যাই হোক, ডারউইনের মৃত্যুর প্রায় বারো বছর পরে হ্যাভলক এলিস তাঁর বিস্তর পরিশ্রম করা লেখা "স্যান অ্যানড উওম্যান" (১৮৯৪) বইতে বললেন—'নারী-পুরুষের মধ্যে মানসিক সক্ষমতায় কোনোই ফারাক নেই। উপরন্তু, খুব সম্ভবত নারীর সত্যনিষ্ঠা পুরুষের থেকে বেশিই।' 'স্বাভাবিক পুরুষোচিত' ধারণার বিরোধী এমন জাতীয় কথা অনেকেই বলেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুরুষ। কিন্তু সমস্যা হল এজাতীয় কথাও যাঁরা বলেছেন তাঁরাও বড়ো বেশি আবেগতাড়িত হয়েই বলেছেন। তাঁদের আবেগ-বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলা যায়, যা বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয় সেই আবেগের কোনো মানে হয় না। তা থেকে শেষমেশ অন্ধ ধারণা, বদ্ধ ভাবনার জন্ম হয়। একটা ডগমা (dogma)-র প্রতিক্রিয়ায় আরেকটা ডগমার জন্ম হয়। কোনো ডগমারই কোনো অর্থ নেই, তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। এই কথাটাই মাও-সে-তুং ভারী সুন্দর ভাবে বলেছিলেন—যে-কোনো ডগমার চেয়ে গোবর বেশি কার্যকর বস্তু। তাই যখন মাথুর ভাজার বলেন—'পরম স্রষ্টা পুরুষ ও নারীকে সমান বুদ্ধিবৃত্তি দান করেছেন', বা জেমস স্টিফেন্স বলেন—'নারীর প্রাজ্ঞতা পুরুষের তুলনায় বেশি', অথবা মারী স্টেনথেল বলেন—'মুক্তির চেয়ে আবেগ নারীর কাছে বেশি বাঞ্ছনীয়'—সবই বদ্ধধারণা, ভাসা-ভাসা কোনো-না-কোনো ডগমা থেকে জাত। ফলে অকার্যকর।

* * *

'জ্ঞানের থেকে উদ্ভাবন, তথ্যের চেয়ে কল্পনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ'—বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই অতিকথিত উদ্‌ধৃতির অর্থ এ নয় যে অপ্রামাণ্য তথ্যের উপর কল্পনার ঘোড়া ছোটানো, অর্ধসত্যের উপর সিদ্ধান্তের হাতি চাপানো। অর্থাৎ, বিজ্ঞানে benefit of doubts বলে কোনো কথা নেই। আমাদের বিজ্ঞান আজও বলতে পারে না—নারীর মানসিক সক্ষমতা ও ধীশীলতা পুরুষের তুলনায় কম না বেশি, না বরাবর। কিন্তু আমরা জানি—বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিশীলতা কোনো শুদ্ধ জিন (gene)-নির্ধারিত গুণ নয়, এবং এই গুণাবলী বংশানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয় না। ফলে, বুদ্ধিশীলতার যৌননির্বাচন ও বংশধারার ধারণা—যা লামার্কীয় বংশগতি তত্ত্বেও উপজাত ও ডারউইনি বিশ্বাস—তা সঠিক নয়। আসলে, এই প্রশ্ন শুধুমাত্র প্রাণিবিজ্ঞানের বিবর্তনের অধ্যায় নয়, এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক বিবর্তনের নানান উপাঙ্গগুলি। এ হল গিয়ে সেই প্রভাবশালী সামাজিক বিবর্তন, যার ধারাতে দ্রৌপদীর মতো প্রখর-বুদ্ধিশীলা নারীকে দিয়ে প্রক্ষিপ্ত সংযোজনে এমনকী নিত্যকর্ম পাঁচালীর সুরে স্ত্রীর কর্তব্য কী—তা বলানো হয়। অথবা, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কোনো এক কড়কড়ে বুদ্ধিজীবীকে বলতে শুনি, 'মেয়েদের বুদ্ধি' ! এ হল গিয়ে নারায়ণশিলার মতোই আকৃতি-হীন ধারণা, অবয়বহীন সংস্কার, অজ্ঞান-অভ্যাস। এর পিছনে কোনো বস্তু-বিজ্ঞান নেই। আছে পুরুষ-প্রধান সামাজিক ধ্যান-ধারণার ডগমা। কিন্তু, এই শেষ নয়। মুক্তির অভীপ্সা যদি বিজ্ঞানের পাথেয় হয়, তার হাত ধরে অন্ধ ধারণার তমিস্রা পিছনে ফেলে মানুষ একদিন আলোকচারী হবেই।

We are the hollow men
We are the stuffed men
Learning together.

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow.

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow.

This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

T. S. Elliot.

প্রতিবেশী সাহিত্য সংস্কৃতি

ঈশ্বর ও মুচি

আর. কে. নারায়ণ

বোধহয় লোকটার কেউ ছিল না, কিছুই ছিল না। মন্দিরের বাইরের দেয়াল আর রাস্তার মাঝখানের মালিকানাহীন একফালি ফাঁকা জায়গায় ও বসত। দেয়ালের ওপর থেকে উঁকিমারা নিমগাছের একটা ডাল ওকে ছায়া দিত আর সারাদিন ওর মাথার ওপর খুদে-খুদে সাদাটে হলুদ ফুল ঝরাত। গত সন্ধে থেকে যে হিপিটি মন্দিরের সিঁড়িতে জাঁকিয়ে বসেছে সে ওখান থেকে ওকে লক্ষ করতে-করতে ভাবল, স্বর্গের দেবতাদেরই কেবল পুষ্পবৃষ্টি উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়। হিপিটি কে ছিল তা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, কারণ আত্মপরিচয় আর যাবতীয় ভৌগোলিক-সম্বন্ধ-মুক্ত হওয়াই তো হিপিত্বের আদত লক্ষণ। সে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে, বহির্মঙ্গোলিয়া কিংবা যে-কোনো জায়গা থেকে এখানে এসে থাকতে পারে। নিজেকে ঘিরে এক দুর্ভেদ্য আবরণ গড়ে তুলতে পারলে তা সার্থক মুখোশের কাজ করে। যদি তুমি খোলা আকাশের নীচে বাস কর, সারা দিনমান রোদে পোড়, তাহলে এমন এক গায়ের রঙ পাবে যা সমস্ত রকম শ্রেণীর তফাত বা জাতপাতের পরিচয় টের পাওয়ার ওপরে আর সেটা তোমাকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অবাধ ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দেবে। তা ছাড়া, যদি তুমি হাঁটু অব্দি ধুতি আর গেনজি পর আর খুব সহজেই যে-কোনো জায়গায় ধুলোয় বসে পড়, তাহলে তোমার পোশাক নিজের থেকেই গেরুয়া রঙের হয়ে যাবে আর তোমাকে একজন সন্ন্যাসী মনে না হয়ে যাবে না। যখন তুমি একবার এ জাতের সাধারণ মানুষের বিশেষত্ব লাভ করেছ তখন আর কে তোমাকে শুধোতে যাচ্ছে যে তুমি কে বা তুমি কী? তুমি যা তোমাকে অবিকল সেইভাবেই মেনে নেওয়া হবে—একটা জ্যান্ত মানুষ। আর তাই তো যথেষ্ট। যখন হিপিটি পথের ধারের মুচির কাছে তার জুতোর ছেঁড়া ফিতেটা জুড়ে নেবার জন্য এসে দাঁড়াল তখন মুচিটি

[ভারতীয় সাহিত্যের প্রবীণ দিকপাল বশিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণ, আর. কে. নারায়ণ নামেই যিনি বিদিত, জন্মেছিলেন মাদ্রাজের এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশে, ১৯০৬ সালের ১০ই অকটোবর। তরুণ বয়সে মাদ্রাজ ছেড়ে তিনি মহীশূরে চলে আসেন এবং সেখানেই পাঠ সমাপ্ত করেন ১৯৩০ সালে। ছোটো-গল্প ও উপন্যাসের লেখক হিসেবে অধিক সমাদৃত হলেও তিনি প্রবন্ধরচনাও করেছেন। লেখকজীবনের সূচনায় তিনি গ্রাহাম গ্রীনের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। পশ্চিমী পাঠকদের কাছে নারায়ণই হলেন সমধিক পরিচিত ভারতীয় ঔপন্যাসিক। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত জাতীয় সংবাদপত্র "হিন্দু"তে তিনি শতাধিক ছোটোগল্প ও স্কেচ লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস "স্বামী ও তার বন্ধুরা" বেরোয় ১৯৩৫ সালে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত "গাইড" উপন্যাসের জন্য ১৯৬০ সালে তাঁকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন—মহীশূর (৩৯) এবং "দি এমারেল্ড রুট" (৭৭)। এ ছাড়াও নারায়ণ মহাভারত (৭৮) ও রামায়ণ (৭২)-এর গদ্যরূপ দিয়েছেন তামিল কবি কাম্বানের তামিল পদ্যরূপ থেকে।

মালগুড়ি নামের এক কাল্পনিক শহরের কথা তাঁর উপন্যাসে ছোটোগল্পে বারবার ঘুরেফিরে আসে।

হিপির সম্বন্ধে এইরকম ভাবছিল।

মুচি তার দিকে একপলক চেয়ে ভাবল, জট-পাকানো ধুসর চুলগুলো কেমন ঘাড়ের ওপর পড়ে আছে, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব, কেবল গলা জড়িয়ে অজগরটি দেখা যাচ্ছে না—এই যা! যাকে এরকম পবিত্র দেবোপম দেখাচ্ছে তার থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মুচি গভীর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাল ও ভাবল, ইনি নিশ্চয় কৈলাসপতি শিবের নিবাস হিমালয় থেকে পথ ভেঙে নেমে এসেছেন। হ্যাঁ, ওঁর ধূলিমলিন কড়া চামড়ায় তৈরি পাদুকাজোড়া দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। মুচি হিপির পা থেকে জুতোজোড়া খুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, ও একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, দয়া করে এটার ওপর পা রাখুন, মাটি তো খুব নোংরা। কাগজের টুকরোটা আসলে ওর পিছনের দেয়ালের একটা পোস্টারের ছিঁড়ে নেওয়া অংশ। তার কাছে পোস্টারের যোগান ছিল অপর্যাপ্ত। পুবের হাইওয়ের দিকে চলে যাওয়া রামনগর আর কালিদাসের মোড়ে মুচির পিছনের দেয়ালটা ছিল খুব চোখে পড়ার মতো। এই জায়গাটায় অবিরল লোকের আনাগোনা আর তাই পোস্টার-সাঁটিয়ের দল এই দেয়ালটাকে ওদের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মুড়ে দেবার জন্য হুটোপুটি করে দৌড়ে আসত। তাদের আগমন হত নিশীথকালে, দেয়ালের এক জায়গায় থিকথিকে আঠা লাগিয়ে দিয়ে তার ওপর পোস্টার সেঁটে দিত। পোস্টারগুলোয় থাকত কোনো নতুন সিনেমার বেরনোর খবর কিংবা পার্কে কোনো বক্তৃতার অথবা নির্বাচনে দাঁড়ানো কোনো প্রার্থীর সংবাদ। তাতে প্রার্থী বা বক্তার ছবি থাকতেও দেখা যেত। দেয়ালের ওই মূল্যবান জায়গাটার বিরোধী দাবিদাররা আবার শেষ রাত্রের দিকে হানা দিয়ে আগে সাঁটা পোস্টার-গুলোর ওপর তাদের মহামূল্যবান বার্তা জাহির করা পোস্টার সেঁটে দিয়ে ভেগে পড়ত। পোস্টারগুলোর বার্তা যা-ই হোক না, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাধা বিন্দুমাত্র বাছবিচার না করে তাদের গতি করত। সেটা মাঝে-মাঝে এদিক ওদিক চলে যেত আবার ফিরে আসত আর দাঁত দিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো দেয়াল থেকে ছাড়িয়ে তুলে চিবুত। সম্ভবত আঠার স্বাদ তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করত। সকালে কাজের জন্যে এসে সবকিছু খুলে গুছিয়ে বসার আগে প্রথমেই মুচি কয়েকজোড়া পোস্টার খচ-খচ করে ছিঁড়ে নেয়, কেননা সে জানে সারাদিনে ওগুলো তার অনেক রকম কাজে লাগবে। কোণের খড়ে ছাওয়া খাবারের দোকানটা থেকে যখন সে কিছু খাবারটাবার পেত সেগুলো ওই কাগজছেঁড়া দিয়ে মুড়ে রাখত; যখন কোনো খদ্দের একপাটি জুতো সারাতে দিয়ে অপেক্ষা করছে তখন মুচি তার খালি পাটা রাখার জন্য একটা

অকাল প্রয়াত শঙ্কর নাগের পরিচালনায় দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে মালগুড়ি শহর ও স্বামীর কাহিনী তো ভারতীয় দূরদর্শক সমাজের কাছে অত্যন্ত সমাদরের সিগ্নিয়াল হয়ে উঠেছিল। নারায়ণের গল্প-উপন্যাসের থিম মূলত ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে পশ্চিমি জীবনবোধের দ্বন্দ্ব। তাঁর চরিত্রগুলি শাশ্বত শান্তির-সত্যের অভিমুখীন এবং তারা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় আশাবাদের দ্বারা জীবনের ও জগতের নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার মোকাবিলা করে। তাঁর ইংরিজি বেশ সহজ, সাবলীল, ব্যঞ্জনাময় অথচ গদ্যের দৃঢ়তায় উজ্জ্বল।

উল্লিখিত বইগুলি ছাড়া তাঁর এই বইগুলিও ভারতীয় ও বিশ্বপাঠকসমাজে খুব আদৃত—"মিঃ সম্পৎ" (১৯৯), "দি ম্যান-ঈটার অব মালগুড়ি" (৬১), মালগুড়ি ডেস্ পার্ট-১ (৪১) এবং পার্ট-২ (৮২)।

কয়েক বছর আগে চীন থেকে এক সাংস্কৃতিক ডেলিগেশন ভারত সফরে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যদি কোনো লেখককে আজ নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে আর. কে. নারায়ণই হবেন যোগ্যতম প্রাপক।]

টুকরো এগিয়ে দিত যেন লাল কার্পেট পেতে দিচ্ছে। মাঝহুপুরে রোদের তেজ প্রখর হয়ে উঠলে মুচি ওই-রকম পোস্টারের কাগজ বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ওকে দেখতে-দেখতে হিপিটা তার অনুরক্ত হয়ে পড়ল। 'ও তো কিছুই চায় না, কিন্তু সবকিছুই ওর কাছে সুলভ।' হিপি ওই মুচির মতো নিজেকে শান্ত, অনুদ্বিগ্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখতে চাইত। আগের দিন সে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে হাত বাড়িয়ে থাকা ভিখিরির দলের মধ্যে বসেছিল। তাদের কারো শক্ত সবল দেহ তার মতো, কেউ-বা অঙ্গহীন, অন্ধ বা জড়বুদ্ধি, তাদের প্রত্যেককে যদিও খুব ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে এক নির্বিকার ভাব সর্বদা বিরাজমান যা সে ঈর্ষা না করে পারে না। সন্ধেবেলায় মন্দিরদ্বার দিয়ে যাতায়াতের পথে ভক্তরা ভিক্ষাপাত্রগুলোতে পয়সা ছুঁড়ে দেয় আর কার বাটিতে কোন্ বিশেষ মুদ্রা গিয়ে পড়বে তা ছিল সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার। ভিখিরিদের মধ্যে একটা সাধারণ বোঝাপড়া ছিল যে তারা প্রত্যেকে এক-একজনকে নিজের-নিজের ভাগ্যের সামনে একাকী দাঁড়াবার সুযোগ করে দেবে কিন্তু অন্ধ লোকটার বাটিতে ঠোক্কর খেয়ে কোনো পয়সা মাটিতে পড়ে গেলে ওরা সেটা তুলে দিত। হিপি তার পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়ার কলায় বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছিল। তাদের ভেতর অলক্ষ্যে মিশে থাকত। এই বিশেষ সন্ধ্যায় মন্দিরের পুরোহিত খুশির মেজাজে ভিখিরিদের মধ্যে মিষ্টি, চাল বিলোত, ভগবানের কাছে নৈবেদ্যের উচ্ছিষ্ট। এটা বেশ তৃপ্তিকর পেট-ভরানো রকমের। তারপর রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে নিয়ে হিপি মন্দিরে প্রবেশদ্বারে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে, সে দেখত মুচি কাঁধে করে চটের বস্তা বয়ে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে আর নিমশাখার নীচে জমিয়ে বসেছে; ধূসর মন্দির-দেয়ালের ওপর দিয়ে সদ্য এসে পড়া অস্পষ্ট রৌদ্রকিরণে সবুজ নিমগাছটা স্নান করছে—এই দৃশ্যরচনা দেখে হিপি অভিভূত হয়ে যায়। এই জায়গাটিতে ছেয়ে-থাকা শান্তির অনুভূতি হিপিকে আনন্দ দেয়। এখানে বোধ হয় কেউ কিছুই পরোয়া করে না। ধুলো, বিশ্বজোড়া যানবাহনের বিপজ্জনক দশা, বিশ্রী আওয়াজ, সাইকেল আর পথচারীদের পরস্পরের ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে পড়া এবং লরি আর স্কুটারের দঙ্গলের মধ্যে পথ কেটে বের করে নেওয়া, যানবাহনগুলো পাগলের মতো দৌড়ত ধুলোর ঝড় তুলে, চাকা কড়মড় করতে-করতে আর বিকট স্বরে হর্ন বাজিয়ে যেন প্রলয়কালের আগের দৈত্যদানোরা পরস্পরকে ধাওয়া করে চলেছে। মাঝে-মাঝে, কোনো এক পথিক কুলকুচো করে কিংবা বাতাসে থুতু ছুঁড়ে দেয়। কেউবা অন্য কারো নজর এড়িয়ে বা ধরা পড়লে প্রতিবাদের মুখে কাবু না হয়ে দেয়ালের গায়ে পেচ্ছাপ করে যায়। জীবন যেভাবে দেখা দেয় এখানে তাকে সেই রূপে সম্পূর্ণ বরণ করে নেওয়া হচ্ছে দেখে হিপি তাজ্জব বনে যায়।

ঘাড় নীচু করে মুচি চামড়া টুকরো করে যায় অথবা তার ছুঁচ দিয়ে চামড়ায় ফুটো করে মোম-লাগানো সুতো টেনে তোলে আর যেন জাদুর মতো চামড়ার সংযোগস্থলে সেলাইয়ের রেখা ফুটে উঠতে থাকে। মনে হয় যেন সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। মুচির একটা জলভর্তি ছোটো টিনের বাটি রয়েছে, অবাধ্য চামড়ার টুকরোকে নরম করার জন্যে সে তাতে ভিজিয়ে রাখে এবং শেষে শক্ত লোহার সুচল দিয়ে ঘায়ের পর ঘা মেরে চামড়াটাকে নমনীয় করে। বিশ্রামের সময় সে পিঠে হেলান দিয়ে বসে আর পথের ওপর চলমান পাশুলোকে লক্ষ করে। এক পলকে তার চোখের ওপর দিয়ে মিছিল করে যাওয়া প্রত্যেকটা ফিতের, পাতলা চামড়ার বা বগলশের দশা দেখে নেয়। যখন সে যন্ত্র চালায় না মনে হয় তার আঙুলগুলো চুলকায় আর সে অবিরাম শানপাথরের ওপর তার আঙুল ঘষে। কর্মব্যস্ত মুহূর্তে তার আত্মবিলোপ দেখে হিপি সিদ্ধান্ত করেছিল যে রুজিরোজগার ছাড়াও এই লোকটা চামড়া নিয়ে কাজ করার সমস্ত ব্যাপারটা এবং ধারালো যন্ত্র দিয়ে চামড়াকে আক্রমণ করার মধ্যে থেকে এক রহস্যময় আনন্দ লাভ করে থাকে নিশ্চয়। তার কাছে এমনকী খাবারদাবারের ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় স্তরের। কোণের খাবার দোকানের ছোঁড়াটাকে ইশারা করে এক কাপ চা অথবা পাঁউরুটি আনতে বলা ছাড়া সে কখনো খাবারের ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি। যখন অনেকক্ষণ ধরে তার কোনো কাজ না থাকে, সে হেলান দিয়ে বসে চোখ রাখে সামনের গাছের মাথায়। তার মন ও মনোযোগ তখন শান্ত। ওই পরিস্থিতিটাকে মেনে নিয়ে সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকত—এমনকী তার মুখের ওপর আকাঙ্ক্ষার বা অনুশোচনার কোনো ছাপও দেখা যেত না। সে কখনো হ্যাংলার মতো কাজ চায় নি, আবার যখন কাজ পেয়েছে তা ফিরিয়ে দেয় নি। তার সামনে কেউ জুতো এগিয়ে দিলে সে কখনো দরকষাকষি করত না, জুতোটা পরীক্ষা করত, লোকটার পায়ের তলায় পোস্টার পেতে দিত, আলগা ফিতেটা অথবা ক্ষয়ে-যাওয়া গোড়ালিটা সারিয়ে দিয়ে তার পারিশ্রমিকের জন্য অপেক্ষা করত। তাকে সহিষ্ণু হতে হয়েছিল - কারণ খদ্দেররা সবসময়ই পার্স খুলতে দেরি করে আর একটা পয়সার জন্য হাতড়ায়। যদি খদ্দের হাড়কেপ্পন হয়ে থাকে তবে হাতের পয়সাটা মুঠো না করে মুচি তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তার ফলে কখনো-সখনো সামান্য কিছু যোগ হয় নতুবা খদ্দেরমশাই সটান ঘুরে দাঁড়ান আর একটিও শব্দ না করে সরে পড়েন।

মুচি যখন তার জুতো সেলাই করছিল, হিপি তার জন্য বরাদ্দ কাগজের টুকরোর ওপর বসে পড়েছিল। তার খুব মজা লাগছিল, কারণ এক রঙিন চিত্রতারকার মাথার ওপর সে কিনা বসে আছে। এমন নয় যে বসার জন্য তার কাগজের দরকার, কিন্তু এরকমভাবে বসাই তো এখানের পক্ষে মানান-সই। তা না হলে হয়তো মুচি আঘাত পেত। খালি জমিতে বসতে হিপি বেশ অভ্যস্ত ছিল। হয়তো যথাসময়ে ও পেরেকবসানো তক্তার ওপর বসার যোগ্যতা অর্জন করবে। আশা করা যায় যে এই-ভাবেই তার গুরুর সন্ধান শেষ হবে, এর বেশি কিছু নয়। তার ভ্রমণের সময় সে বেনারসে পেরেকের ওপর গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে থাকা যোগীদের দেখেছে। গয়াতে সে এমন একজন প্রায়শ্চিত্তকারীকে দেখেছিল যার দু গাল ভেদ করে জিভ ফুঁড়ে একটা লম্বা পেরেক চলে গিয়েছে, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ লোকটা মৌনব্রত পালন করছিল। এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে সে লক্ষ-লক্ষ নর-নারীকে প্রার্থনা করতে আর ডুব দিতে দেখেছে। ওই লক্ষ জনতার মধ্যে ছিল এক সাধু, তার সঙ্গে এক পেল্লায় বাঘ, বাঘটা নাকি আসলে সাধুর বহু জন্ম আগেকার হারিয়ে-যাওয়া ভাই। ভয়ানক সব অজগর নিয়ে লোকেরা নাড়াচাড়া করছিল, যেন সেগুলো নিরীহ দড়ি বই আর কিছু না। সে অনেক অগ্নিভুক, তরোয়াল গিলেফেলা এবং কাঁচ ও ক্যাকটাস চিবিয়ে খাওয়া লোক দেখেছিল। শ্মশানভূমিতে যোগীদের বসে থাকতে দেখেছিল। সারা দিন, সারা রাত, আহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন, গতিরহিত এবং তাদের চারপাশ ঘিরে জ্বলন্ত চিতায় পুড়তে থাকা মড়াগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। নেপালে একজন হাতের কৌশলে হালকা বাতাস থেকে একটা রুপোর মূর্তি বের করে এনে তাকে দিয়েছিল—সে যত্ন করে সেটা তার থলেতে রেখে দিয়েছিল—চারহাতওয়ালা এক দেবীর ছোট্ট মূর্তি। প্রত্যেকবারই প্রথমে সে যারপরনাই বিস্ময়ে টইটম্বুর হয়ে যেত আর তাদের গুপ্তবিদ্যা শিখতে চাইত। বিস্ময়কর খেল-দেখানো কারিগররাও তাকে তাদের বিদ্যা শেখাতে উৎসুক। বিনিময়ে তারা হিপির কাছ থেকে একপুরিয়া আফিমের বেশি কিছু চাইত না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিপি নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল —এইসব কীর্তিকলাপ শিখে আমার কীই বা লাভ হবে? ঘোরের মধ্যে হাঁটা ছাড়া এ আর এমন বেশি কী? কেবল কম খরচের এই যা। তার জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির সে কোনো উপায় পেল না। হাইওয়ের ওপর, গ্রামের ভেতর আর ধানের খেতে কাজে ডুবে থাকা নারীপুরুষদের সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখত। তাদের মুখগুলো থমথমে আর গম্ভীর কিন্তু কখনো বিক্ষোভ-সংকুল নয়। সে অনুভব করল যে এদের মধ্যে অনুসন্ধান করে জানার যোগ্য জীবনদর্শন রয়েছে। হিপি ট্রেনে-ট্রেনে ঘুরে বেড়াতে লাগল, পায়ে হেঁটে চলতে লাগল, পথের মধ্যে দাঁড় করিয়ে লরিতে অথবা গোরুর গাড়িতে চড়ে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কেন? সে নিজেই খুব স্পষ্ট করে তা জানত না।

মুচির সঙ্গে কথা বলার তার খুব সাধ হত। সে একটা বিড়ি বের করত কারণ সাধারণ মানুষে বিড়ি খুব ভালোবাসে। (সিগারেট হল কৃত্রিম আর তা দুরূহ বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু এক পয়সায় চারটে পাওয়া যায় এরকম একটা বিড়ি আমজনতার সঙ্গে সহজেই তোমার নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে দিতে পারে।) মুচি সেটা নিতে ইতস্তত করলে হিপি তাকে বলত, 'না, না, নাও, তোমার এটা ভালোই লাগবে, খুব ভালো জিনিস, তোতাপাখি মার্কা···।' এই বলে তার ঝোলা থেকে দেশলাই বের করল। তারপর ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ ধূমপান করে, বাতাসে পাতাপোড়া ধোঁয়ার গন্ধ পাক খেয়ে যায়।

অটোরিকশা আর সাইকেলগুলো ওখানে হঠাৎ বাঁক নেয়। এক আইসক্রিমওলা তার গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে আসে আর খদ্দের জড়ো করার জন্য ছোটো রবারের হর্নটা বিকট শব্দে বাজায়। তার খদ্দের ইস্কুলের সেইসব ছেলেমেয়েরা যারা তক্ষুনি গেট দিয়ে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসবে। আলাপ শুরু করার চেষ্টায় হিপি বলল, 'তোমার ওপর পুষ্পবৃষ্টি হয়।' এই বলে সে গাছের ওপর থেকে ঘুরতে-ঘুরতে-নামা থুদে-থুদে সাদাটে হলুদ ফুলগুলো দেখায়। মুচি দেখত এবং তার কোট থেকে চটাত করে ঝেড়ে ফেলত। পাগড়ি থেকেও হাত দিয়ে ফেলে দিত। পাগড়িটা যদিও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তবু তাকে রোদ-বৃষ্টি থেকে বহুকাল রক্ষা করে এসেছে এবং তার ব্যক্তিত্বে একটা মহিমা যুক্ত করেছে। হিপি আবারো বলত, 'সারাদিন এই যে তোমার ওপর ফুল ঝরে পড়ে, তুমি নিশ্চয়ই পুণ্যবান।'

মুচি হিপিকে দেখে নিয়ে চটাং করে জবাব দিত, 'আমি কি ফুল খেয়ে বাঁচতে পারি নাকি? আমি কি এগুলো ঘরে নিয়ে আমার বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলতে পারি, নাও এবার রান্না করো? যদি কোনো ভরাপেটের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হয়, সে ভিন্ন কথা—স্বর্গের দেবতাদের ওরকম লোকদের ওপর ঝরাবার ফুল দেদার আছে, কিন্তু এটা জেনে রাখো, আমার মতো লোকের ওপর নয়।'

'তুমি কি ভগবানে বিশ্বাস কর', হিপি শুধোয়, আর এই প্রশ্ন শুনে মুচি অবাক হয়ে যায়। এ ধরনের প্রশ্ন কারো মনে কখনো জাগে কী করে? সম্ভবত এই রহস্যময় খদ্দেরটি তাকে পরীক্ষা করছে। ওর উত্তর দেওয়ার বেলায় সতর্ক থাকাই ভালো। মুচি তার সামনের মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করল এবং হতবুদ্ধি হয়ে আকাশের দিকে হাত তুলল, 'কখনো-কখনো তিনি আমাদের খোঁজখবর নেন না সত্যি। তিনি তা কী করেই বা করবেন বল? তাঁর যে দেখাশোনা করার লোকের সীমাসংখ্যা নেই।' ভগবানের একটা ছবির দিকে চেয়ে সে কয়েক মিনিট ভাবতে লাগল যে-ভগবানের মনোযোগ চতুর্দিকের লক্ষ-লক্ষ ভক্ত-প্রার্থীদের চিৎকার চেঁচামেচির চোটে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। সে বলতে লাগল, 'আমাদের বড়ো অফিসার, ওই কালেকটার সাহেবের কথাই ধরুন না কেন—তিনি কি সবাইকে দেখা দিতে পারেন? না তিনি সবাইকার আর্জি শোনার সময় পান, আর সব দরখাস্তের জবাব দিতে পারেন? যখন একজন মানুষ অফিসারের নাগাল পাওয়াই এত ঝামেলার, তখন ভগবানের কাছে পৌঁছানো আর কত বেশি কঠিনই না হবে! তেনাকে কত কীই না ভাবতে হয়—' মুচি তার দু-বাহু তুলে দিগন্ত থেকে দিগন্তে স্বর্গের বুকে নাড়া দিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের বিশালত্ব সম্বন্ধে এক বোধে হিপির মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মুচি বলে চলল, 'আর তিনি তো ঘুমুতেও পান না। আমাদের এই মন্দিরের পণ্ডিতমশাই একবার বলে-ছিলেন যে দেবতারা তেনাদের চোখের পাতা ফেলতে পান না। তেনাদের ঘুম নেই গো। কী করে ঘুমোবেন? চোখের একপলক পড়া মাত্তর পিথিমিতে কত কী কাণ্ডই না ঘটে যেতে পারে! কত ক্ষতি তার কি গুনতি আছে? প্রহরা যে যার ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এ-ওর ঘাড়ে ভেঙে পড়তে পারে, আকাশ সব সময় আগুন আর গন্ধক বিষ্টি করতে পারে, কিংবা পাতাল থেকে যন্তো শয়তান-দানো বেরিয়ে পড়ে মানুষের বংশকে গিলে ফেলতে পারে। ওঃ, ছিষ্টি একদম রসাতলে, বেমহাও যায়-যায়।'

ঈশ্বরের এক পলকপাতে যে ধ্বংসতাণ্ডব আমাদের ওপর আছড়ে পড়তে পারে তার দৃশ্য কল্পনা করে হিপি দারুণ কেঁপে উঠল। মুচি বলল, 'আমি ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করি আর প্রত্যেক মুহূর্তে মিনতি জানাই। তিনি যেই একটু ফাঁক পাবেন অমনি নির্ঘাত আমার কথা শুনবেন, আর ততদিন অব্দি আমাকে তো সহ্য করতেই হবে।'

'কী, কী সহ্য?' হিপি কৌতূহল ধরে না রাখতে পেরে শুধাল।

'এই জেবনটাকে গো। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। সময় নিশ্চয়ই আসবে। আসবে বইকি।'

'কেন, বেঁচে থাকতে তোমার ভালো লাগে না?'

আমি আপনাকে বুঝতে পারি না', মুচি বলল, আর পরক্ষণেই একটা চলমান পা দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়ল, 'হেই! বকলশটা খুলে গেছে। এসো, এসো, দাঁড়াও।'

এক তরুণ ছাত্র ছিল তার লক্ষ্য। এক মুহূর্তের জন্য। পাজোড়া এক সেকেনডের জন্য থামল, একটুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর হারিয়ে গেল। মুচি অবজ্ঞার ভঙ্গি করল, 'দেখুন, আজকালকার ছোঁড়ারা কেমন হয়ে উঠেছে! ওরা তোয়াক্কাই করে না। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ওদের অপচয়ের অভ্যাসে ধরেছে। ও বাড়ির দরজায় পৌঁছবার আগেই জুতোর বকলশটা খুলে যাবে। তখন ও সেটাকে হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন জুতো কিনে নেবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'আজকাল ওদের চালচলন বড়োই অদ্ভুত। মাত্তর পাঁচ পয়সা খরচ করলেই ও জুতো-জোড়া আর এক-বছর নিশ্চিন্তে পরতে পারত।' কয়েক জোড়া জুতো দেখিয়ে সে বলল, যার কিছু তার চটের বস্তায় সাজানো রয়েছে, 'এই-সমস্ত জুতো আমি এদিক-ওদিক থেকে কুড়িয়ে এনেছি। ওইরকম ছোঁড়ারাই এগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে। দেখতে-দেখতে এই ইস্কুলের সামনের রাস্তার ধারটা জুতোয় ভরে যায়। বাড়িতে ছেঁড়া জুতো বয়ে নিয়ে যাবার মেজাজ ছেলেদের নেই। হাতে করে জুতো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটা লোকে দেখছে ভেবে বাচ্চারা নিশ্চয় লজ্জা পায়। আমার এই ভাঁড়ারের সবগুলো যে একই জোড়ার আর এক রঙের, তা কিন্তু মোটেই নয়। হে হে! আমি চামড়া কেটে, রঙ করে বাকি পাটিটা বানিয়ে জোড়াটা তৈরি করি।' জোড়া মেলানোর কৃতিত্বের জন্য তাকে খুব গর্বিত বোধ হল। 'যদি আমি বেশ কিছুদিন এইগুলোকে রেখে দিই, ভগবান আমার কাছে একজন খদ্দের পাঠিয়ে দেবেনই আর সে লোক দারদারির মর্ম বুঝবে। যে দামই আমি পাই না কেন তা আমার কাছে যথেষ্ট ভালো।'

'কারা ওগুলো কেনে?'

'ও যে কেউ। বেশিরভাগ সময়ই যখন কোনো বাড়ি-তৈরির কাজ চলে, যাদের সিমেনটের ওপর

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, তাদের পা বাঁচানোর জন্যে ওরা আমার জুতো পছন্দ করে। যে-কোনো ভাবেই হোক আমাকে রোজ পাঁচ টাকা রোজগার করতেই হবে—কিছু ভালকলাই কিংবা চাল কিনে বাড়ি ফেরবার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরে দুটো খালি পেট আমার ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে। কী দিনকাল আসছে! দুবেলার আহার জোটানো সহজ নয়। এমনকী এক পয়সায় মাত্তর দুটো পানপাতা হয়ে গিয়েছে। কুড়িটা না হলে তো ওদের চলেই না। একমুঠো ভাত না পাক, আমার গিন্নির তো পান না চিবুলে চলবেই না। এ জীবনে ভগবান আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন। গত জন্মে আমি নিশ্চয় গরিবের-রক্ত-নিংড়ে-নেওয়া এক সুদখোর মহাজন ছিলাম, কিংবা লাভের ধান্দায় চাল-মজুত-করে-রাখা কোনো চোরা-কারবারি—যতক্ষণ না এই হিসেব-নিকেশ চুকছে, ভগবান আমাকে এখানে রেখে দেবেন। আমাকে কেবল সহ্য করতে হবে।'

'পরের জন্মে তুমি কী হতে চাও?'

মুচির মধ্যে আবার এক আকস্মিক অনুভূতির উদয় হল। সে যে-কোনো দেবতা কিংবা দেবদূতের সঙ্গে যেন কথা বলছে। সে প্রশ্নটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। 'আমি এই পিথিমিতে আর জন্মাতে চাই না। কে জানে, ওরা আমাকে নরকে পাঠাবে কিনা, কিন্তু আমি নরকে যেতে চাই না।' সে পরলোকের এক কল্পদৃশ্যের ব্যাখ্যা দিল যেখানে এক প্রবল-প্রতাপান্বিত হিসেবরক্ষক বসে-বসে ঋণ ও জমার হিসেব পরীক্ষা করে চলেছেন এবং প্রত্যেক লোকের উপযুক্ত খতিয়ান টেনে দিচ্ছেন।

'তুমি কী করেছ?' হিপি শুধোল।

মুচির মনে আবার সন্দেহ জাগল যে সে এতক্ষণ ধরে এক দেবতার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। 'মদ খাবার সময় কেউ মনে রাখে না যে সে কী করছে' ও বলল। 'এখন আমার শরীল অসাড় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু যৌবনকালে কেউ তো তার শত্রুর ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, রাতের বেলায় যখন তার ছেলেপুলেরা সেখানে ঘুমোচ্ছে। সামান্য ঝগড়া থেকে এমন কাণ্ড বাধানো অসম্ভব নয়। ওই লোকটা আমার টাকা নিয়ে নিয়েছিল, আমার বউয়ের সর্বোনাশ করার ভয় দেখিয়েছিল, আর আমি যখন সন্দেহের বশে আমার বউকে পেটাচ্ছিলাম, হাতাহাতির মাঝখানে সে ওর একটা চোখ থুইয়ে বসল। আমাদের দেদার টাকা ছিল আর সেই সময় এক টাকায় তিন বোতল দিশি মদ পাওয়া যেত। আমার একটা ছেলে ছিল। ও মরে যাবার পরই আমি বদলে গেছি। আমাদের ঘরে এখন যে ছেলেটা রয়েছে সে তো আমার ওই বন্ধুর।'

'আমি কিছু শুধোতে চাই না, কারণ আমিও তো গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছি। গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে লোকদের মাথায় বোমা ফেলেছি যাদের আমি জানতাম না, কখনো দেখি নি।' হিপি বলল। বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়ে মুচি চোখ গোলগোল করে তাকাল—'কখন, কোথায়, কোন্‌খানে?' হিপি বলল, 'গত জন্মে, অন্য এক রূপে। তুমি কি আন্দাজ করতে পার আমার পরের জন্মের জন্যে কী জমা হয়ে আছে?' মুচি জানাল, 'মন্দিরের পুরুত আসা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। একজন জ্ঞানী মানুষ, তিনি আমাদের বলে দেবেন।'

'যে লোকটার কুঁড়ে তুমি জ্বালিয়ে দিয়েছিলে তোমার তো অন্তত তার ওপর প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। আমি তো জানতামই না কার কুঁড়েঘর আমি ধ্বংস করে দিচ্ছি। আমি তাদের তো চোখে দেখিও নি।'

'কেন, কেন? তারপর?' হিপি কথা বলতে চাইছে না দেখে মুচি বলল, 'যদি সেদিন থাকত রে ভাই, আমরা দুজনে মিলে খেতাম আর নেশায় চুর হয়ে থাকতাম।'

'পরের জন্মে' হিপি বলল, তারপর উঠে দাঁড়াল। সে জুতোয় পা গলিয়ে দিল। 'আমি আবার আসব।' সে সঠিক জানে না এখন কোথায় চলেছে কিংবা কোথায় গিয়ে থামবে। কথামতো সে মুচিকে পঁচিশ পয়সা দিল, তারপর তার ঝোলা থেকে রুপোর মূর্তিটা বের করে মুচির দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'তোমার জন্য এটা রইল…'

মুচি সেটা নেড়েচেড়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও, ইনি যে দেবী দুর্গা। ইনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি কি এটা চুরি করেছিলে?'

প্রশ্নটা হিপির মনে ধরল, কারণ প্রশ্নের ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তাকে আর এখন সম্ভ্রান্ত দেখায় না। সে জবাব দিল, 'সম্ভবত যে লোকটা এটা আমাকে দেয়, সেই এটা চুরি করেছিল।'

'রাখো, রেখে দাও, ইনি তোমাকে রক্ষা করবেন' রুপোর মূর্তিটা ফিরিয়ে দিয়ে মুচি বলল। হিপি চলে যাবার পর সে চিন্তা করে দেখল, 'সুযোগ পেলে এমনকী একজন দেবতাও চুরি করতে ছাড়ে না।'

অনুবাদ: মেঘ মুখোপাধ্যায়

মতামত

১

দান্তের এঙ্গেলসকৃত মূল্যায়ন কতখানি বস্তুনিষ্ঠ ?

চতুরঙ্গ জুলাই সংখ্যায় (২৬১পৃ) শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় দান্তে এবং ইতালি প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের একটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন : '…প্রথম ধনতন্ত্রী দেশ ইতালি। সামন্ততন্ত্রী মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল এক অসাধারণ বিরাট মানুষের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। তিনি হলেন দান্তে ; একাধারে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি।…' ইত্যাদি।

আনুগত্যের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রবক্তার বাণীতে অন্ধ বিশ্বাস ধর্মের একটি মৌলিক চরিত্র-লক্ষণ। বলা হয় বটে, মার্কসবাদ ধর্ম নয় ; কিন্তু অনুগামীরা একে কার্যত তা-ই করে ফেলেছেন। মার্কসের জীবদ্দশায় এই কাণ্ডকারখানা দেখে স্বয়ং মার্কসের আক্ষেপোক্তি এঙ্গেলসেরই জবানিতে আমরা শুনেছি।

তো ইতালি প্রথম ধনতন্ত্রী দেশ, এই এঙ্গেলসীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তি একটু নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে। শিল্পপণ্য উৎপাদনে ইউরোপে 'গিল্ড'-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এগারো শতক থেকে। তৎকালীন বিশ্বে শিল্প-পণ্য-বাণিজ্যে প্রভূত্বকারী আরব এবং চীনের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নামার জন্যই এ ছিল বস্তুত এক ধরনের রণকৌশল। আরবরা সিসিলি দ্বীপ এবং ইতালির কিয়দংশ দখলে রেখেছিল ৮২৭ থেকে ১০৯৪ সাল পর্যন্ত। যা-ই হোক, ইউরোপে দু ধরনের গিল্ড দেখা যায় : বণিকদের এবং কারিগরদের। উভয় ক্ষেত্রেই লগ্নিকারী ছিলেন সামন্ত বা ধনাঢ্য কৃষক। এঁরা বাস করতেন নগরে এবং গণ্য হতেন অভিজাতবর্গীয় (নোবল) হিসেবে। সূচনাপর্বে লগ্নির কড়ি আসত নগরের বাইরে কৃষিসম্পত্তি থেকে। ক্রমশ বাণিজ্যিক মুনাফাও লগ্নিতে যুক্ত হতে থাকে। নগরের সমৃদ্ধি ঘটে। তার ফলে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ে। গিল্ড-অধ্যুষিত এইসব সমৃদ্ধ নগরকে প্রাকারে ঘিরে ফেলা হয়। এক ধরনের নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ইউরোপের অন্যত্র এগুলি স্ব-শাসিত হলেও রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল। ইতালির গুটিকয় নগররাষ্ট্র ছিল স্বাধীন, কিন্তু পোপের অনুগত। এটাই ইতালির যা বৈশিষ্ট্য। নোবলদের সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রের বোঝা-পড়ার কারণ রাজতন্ত্রের শোষণের কবল থেকে আত্মরক্ষা। এগুলিকে 'রিপাবলিক' আখ্যাদান চাতুরীমাত্র। পরবর্তী কালে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা ইতালিতে "কমিউন" আবিষ্কারও করে ফেলেছেন! তা করুন। কিন্তু আকারে বণিকতন্ত্রী প্রকারে নোবল-তন্ত্রী ইতালীয় এইসব নগররাষ্ট্রে 'প্রথম ধনতন্ত্র'দর্শন রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র! নোবলতন্ত্রের আত্মা ছিল একান্তভাবে সামন্ততন্ত্রীই। বাণিজ্যে সংঘবদ্ধভাবে লগ্নিকৃত ধনকে 'সংগঠিত মূলধন' নিশ্চয় বলা চলে। কিন্তু সেটাই ধনতন্ত্রের একটি মৌল চরিত্র-লক্ষণ বলে যদি সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে জটিলতা বাড়ে। সংগঠিত মূলধনও গুণগত বিচারে মূলধন ছাড়া আর কিছুই নয়। ফল দেখেই তো গাছের গুণাগুণ বিচার করব। মূলধন সংঘের হোক কি ব্যক্তিগত হোক, দেখতে হবে সমাজ-সংস্কৃতিতে তার কী ধরনের গুণগত প্রভাব পড়েছে। দান্তের সমকালীন ইতালিতে যে অভিজাতবর্গের আধিপত্য দেখি, তাদের কোনো-ভাবেই তথাকথিত 'মার্কেনটাইল বুর্জোয়াজি' আখ্যাও দেওয়া যায় না (এই বুর্জোয়াতন্ত্রকে প্রাক্-পুঁজিবাদী বুর্জোয়াতন্ত্র বলা হয়)। প্রকৃত ধনতন্ত্রের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই ইংল্যানডে শিল্পবিপ্লবের পরে। তখনই সমাজ-সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং

'সংস্কৃতির ভ্যানগার্ড'-এর ভূমিকায় দেখা দেয় যারা, তারাই আদি বুর্জোয়া। কাজেই এঙ্গেলসের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছিল।

দান্তের জন্ম গিল্ড-অধ্যুষিত স্বাধীন নগররাষ্ট্র ফ্লোরেন্সে ১২৬৫ সালে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল Guelph-এর হাতে। এদের দুটি গোষ্ঠী 'সাদা' এবং 'কালো'-র মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল প্রচণ্ড। গুপ্তহত্যা চলত পরস্পরের মধ্যে। দান্তে ছিলেন সাদাদের দলে। কালোরা সাদাদের উৎখাত করে। দান্তে প্রাণ নিয়ে পালান। তারপর তাঁকে দেখি কট্টর রাজ-তন্ত্রী (Ghibelline) রূপে। Guelph-Ghibelline বিরোধে নিজের ভূমিকার সাফাই গাইতে তিনি লাতিনে "De Monarchia" লিখে ফেলেন। তাঁর আশা ছিল, রাজা সপ্তম হেনরি ফ্লোরেন্স দখল করবেন। তাঁকে হতাশ করে রাজা মারা যান। 'কালো'রা শর্তসাপেক্ষে দান্তের মৃত্যুদণ্ড রদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দান্তের পক্ষে থুথু গেলা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া দান্তে অতীত রোমান সাম্রাজ্যকে ঐশী বিশ্ববিধান গণ্য করতেন। রাজাই তাঁর কাছে মর্ত-লোকে ঈশ্বরের প্রতিভূ।

হিতৈষী বোকাচ্চিও তাঁকে প্যারিসে নিয়ে যান। ভগ্নহৃদয় দান্তের মন টেঁকে নি। ফিরে এসে কিছুকাল ভেরোনা এবং বাকি জীবন রাভেন্নাতে কাটান। মারা যান ১৩২১ সালে। প্রথম যৌবনের ব্যর্থ প্রেম, রাজনৈতিক হতাশা এবং স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ (তাঁর স্ত্রী ছিলেন 'কালো' পরিবারের কন্যা) দান্তেকে চূড়ান্তভাবে ধর্ম- এবং ঈশ্বর-মুখী করে। সেই তুরীয় দশার সৃষ্টি 'Commedia' এবং যেহেতু বোকাচ্চিও তাঁকে 'Divine Poet' আখ্যা দিয়েছিলেন, তাই ১৫৫৫ সালে কাব্যটির সম্ভ্রান্ত টাইটেল দেওয়া হয় "LaD ivina Commedia", যা ইংরেজিতে "ডিভাইন কমেডি" নামে খ্যাত।

জানা কথাগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম স্বার্থবশত। কিন্তু এঙ্গেলসের সিদ্ধান্ত অনুসারে সত্যিই কি দান্তের সমকালে 'সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগের সমাপ্তি' ঘটে 'আধুনিক যুগ' দেখা দিয়েছিল ? আবার রজ্জুতে সর্পভ্রম।

যে ইউরোপীয় Medievalism গথিক চার্চ-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার গৌরবগাথা প্রচার করছিল, দান্তের কবিপ্রতিভা তাকে তুঙ্গে তুলে দেয়। প্লতি-নাসের ব্যাখ্যাকৃত 'নব্যপ্রাতোতত্ত্ব' এবং সন্ত আকি-নাসের 'সামাতত্ত্ব' (বিশেষত Summa Contra Gentiles) ইউরোপের খ্রীষ্টীয় চৈতন্যে দান্তের কাব্যের মাধ্যমে বস্তুমাত্রিক বর্ণালীর বিচ্ছুরণ ঘটায়। এর মধ্যে আধুনিকতা তথা প্রগতির ন্যূনতম উপাদান মেলে না। দান্তে মুহাম্মদ, তাঁর জামাতা আলি, সালাদিন এবং মসজিদগুলিকে নরকে (Inferno) ঢুকিয়েছেন। তা ঢোকাতেই পারেন। সক্রাতেস, প্লাতো প্রমুখকেও ঢুকিয়েছেন। ভালো কথা। বিশ্বের প্রাচীনতম বস্তুবাদী দিমক্রেতাস এবং তাঁর উত্তরসূরি এপিকিউরাস ও সেই ধারার দার্শনিকদেরও নরকস্থ করেছেন। স্বাভাবিক। কিন্তু ইব্ন্‌সিনা (Avicenna), ইব্ন্ রুশ্‌দ্ (Averrosse) প্রমুখ দার্শনিককে নরকস্থ দেখেও এঙ্গেলস মহোদয় নির্বিকার কেন, বোঝা যায় না। দান্তের সমকালের ইতালিতে Latin Averrosist গোষ্ঠী সগৌরবে বিদ্যমান ছিলেন। আকিনাসের সমকালে (১২২৫-১২৭৪) এঁদের মুখপত্র ছিলেন প্রখ্যাত 'Siger of Berbant' এবং তাঁরা মানবিক যুক্তিবাদের অখণ্ডনীয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন রুশদীয় দর্শনে। এই আরব দার্শনিকরাই দর্শনকে থিওলজির বাইরে দাঁড় করিয়েছিলেন, ইউরোপে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে-ছিলেন এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, রেনেসাঁসের পিছনে এঁদের অবদান পূর্ণ মর্যাদায় স্বীকৃত। উল্লেখ্য ঘটনা, ব্যারনসন্তান সন্ত আকিনাসের নিকটাত্মীয় সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক রুশদীয় গ্রন্থাদির হিব্রু অনুবাদের লাতিন অনুবাদ করান। ১৫৫৩ সালে ভেনিসে আরবি থেকে সরাসরি লাতিনে নিখুঁত

অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বিচিত্র ব্যাপার, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বপাঠে আকিনাসের প্রতিপাদ্যে ইসলাম খিও-লজির হুবহু প্রতিধ্বনি আবিষ্কৃত হবে।

তো আধুনিকতা তথা প্রগতির তাত্ত্বিক উপাদান ছিল দান্তের বিরোধী শিবিরেই। রুশদীয় তত্ত্বের সমর্থকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল Medieva-lism-কে খণ্ডন করার জন্য আরিস্তোতলীয় তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা, যা রুশদ্ তাঁদের যুগিয়েছিলেন। অথচ এঙ্গেলস প্রগতির পরিপন্থী একটি কূপমণ্ডুক এবং মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াকে 'আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল' বলে চিহ্নিত করেছেন, এটা অদ্ভুত লাগে। এ সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চিরাচরিত একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

অস্বীকার করা চলে না, ইতালীয় ভাষার প্রতি দান্তের প্রবল অনুরাগ ছিল এবং লাতিনকে অগ্রাহ্য করার যুক্তি দেখিয়ে 'De vulgari Eloquentia' লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'Il convito' থেকেই এই অনুরাগ প্রকাশ পায়। জনসাধারণের মুখের ভাষার প্রতি দান্তের অনুরাগ সমকালের হাওয়ার টানেও বটে, আবার জন্মসূত্রে তিনি 'নোবল' নন, সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন, এ-ও একটা প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু যে 'Commedia'-র জন্য দান্তের খ্যাতি, তাতে কী পাই আমরা? আমার কাছে এম বি অ্যানডার্সনের ইংরেজি (উইলিয়াম ব্লেক কর্তৃক চিত্রিত, প্রকাশক দা হেরিটেজ প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৪৪) সঠিক অনুবাদটি আছে, স্বনামধন্য আর্থার লিভিংস্টোনের বিস্তারিত ভূমিকাসহ। আমার আশ্চর্য লাগে, দান্তেকে আজও 'সেকুলার' বলা হয়! সুপ্রাচীন ভারতীয় 'কুমারসম্ভবম্'-এর পাত্র-পাত্রী দেবতা হওয়া সত্ত্বেও তার কবি কী অবিশ্বাস্যভাবে 'সেকুলার' এবং মানবিক। আর Commedia-র অসংখ্য চরিত্র মানুষ এবং কবির ভ্রমণসঙ্গীও মানুষ (প্রথমে ভার্জিল, পরে বিয়াত্রিচে)। অথচ কবি কী প্রচণ্ড ধর্মান্ধ এবং সাম্প্রদায়িক! Inferno-র তিক্ত স্মৃতি Purga-torio-র ধোলাইয়ের পর Paradiso-র শেষ পঙ্‌ক্তি অবধি থচথচ করে বেঁধে। স্বর্গভ্রমণের অন্তে কবি যখন 'ভালোবাসা' শব্দটি উচ্চারণ করেন, সঙ্গিনী বিয়াত্রিচের দিকে তাকিয়েও আর শব্দটির মানবিক তাৎপর্য খুঁজে পাই না। অবশ্য নরকদর্শনের পর অম্লানবদনে স্বর্গারোহণে ব্রতী হওয়ার মতো স্থিতধী ও নির্বিকার যুধিষ্ঠির অনেক আছেন। তবে তাঁরা ধর্মপুত্র। দান্তে যাঁদের নরকস্থ করেছেন, এ ধুলো-মাটির জগৎটাকে তাঁরাই কিন্তু বাসযোগ্য এবং অর্থ-পূর্ণ করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দান্তে এ শতকে জন্মালে মার্কস-এঙ্গেলসকেও নরকে ঢোকাতেন। মিস্টিক সন্ত কবির এই ভ্রমণকে 'আত্মিক ভ্রমণ' বলা হোক কি নিছক নান্দনিক উৎকর্ষের দোহাই পেড়ে কলাকৈবল্যবাদীরা যতই নৃত্য করুন, এর ছত্রে-ছত্রে নরকের দুর্গন্ধ লেগে আছে।

পরের মুখে ঝাল খাওয়া অনুচিত। তবে উল্লেখের দরকার মনে করছি যে, ভোলত্যের দান্তের কাব্যকে 'stupidly extravagant and barbarous' বলেছিলেন। সঙ্গত কারণেই গ্যয়টে, মিল্টন, তাসো, হোরেস ওয়ালপোল প্রমুখ নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। Nietzsche বলেছিলেন, 'a hyena poetizing in the tombs।' বারট্রান্ড রাসেলের মতে, দান্তে এবং বোকাচ্চিও দুজনেই চার্চের 'deep service' দিয়েছেন এবং 'Dante's thought is interest-ing, not only in itself, but as that of a layman; but it was not influential, and was hopelessly out of date'. (*A History of Western Philosophy*, 1972, Simon & Schuster, New York, p. 470) এঁদের আমি পীর-পয়গম্বর গণ্য করি না। কিন্তু এঁদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের মর্মান্তিক কৌতুক: দান্তে যদি 'ইতালীয় জাতীয়তাবাদের' বীজ পুঁতে গিয়ে থাকেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় ছশো বছর পরে তা থেকে ফ্যাসিজমের বিষবৃক্ষ গজিয়েছিল। আমরা রেনেসাঁসের পরও আবার ইনকুইজিশনের ভয়াল প্রেতনৃত্য দেখেছি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পরবর্তী পর্যায়ে দেখেছি সাম্প্রদায়িকতা, পরিণামে ভারতভাগ এবং আবার দেখছি হায়েনারা 'poetizing in the tombs!' কোথায় আধুনিকতা? আসলে নিছক কাব্য-সাহিত্য-শিল্প-কলার নান্দনিক উৎকর্ষের নিরিখে মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের আধুনিকতাবিচার ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য। এঙ্গেলসের ভাবাতিশয্যাক্রান্ত সিদ্ধান্তটির দুর্বলতা সম্ভবত এখানেই।

আরও কথা আছে। দান্তের গ্রীক সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। কিছুটা লাতিনসূত্র এবং কিছুটা আরবসূত্র থেকে ওই বিষয়ে আবছা ধারণা ছিল। ইতালীয় রেনেসাঁসে দান্তের 'আর্ট' স্বীকৃতি পায় নি। তবে ধর্মতত্ত্ব কিছুটা গ্রাহ্য ছিল এ কারণে যে, তাতে জাতীয় ভাবাবেগের মোড়কে ক্যাথলিক উপাদানগুলি ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, 'Commedia'-কে মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য করাও হয় নি। গ্রীক এবং লাতিন মিস্টিকদের উত্তরসূরি হিসেবেই দান্তের খ্যাতি। এ শতকের দ্বিতীয় দশকে এক স্প্যানিশ অধ্যাপক M. Asin Palacios একটি বই লেখেন "La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia", যেটি ১৯২৬ সালে H. Sunderland ইংরেজিতে অনুবাদ করেন 'Islam and Divine Comedy' নামে এবং লনডন থেকে প্রকাশিত হয়। ইসলামের পয়গম্বরের ঈশ্বরসন্নিধানে একটি নৈশ সফর (মিরাজ) কেন্দ্র করে আরব এবং পারস্যের মিস্টিক কবিরা অসংখ্য কাব্য লিখেছিলেন। আরবিতে তা 'কিতাব আল-মিরাজ' এবং ফারসিতে 'মিরাজনামাহ্' বলা হত। মৌখিক লোকগাথাও চালু ছিল। স্পেনের ইব্‌ন্ আল-আরাবি (মৃত্যু ১২৪০) বিষয়টিকে 'মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার বিভিন্ন স্তর' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং অন্যেরা ব্যাখ্যা করেছিলেন 'আত্মিক ভ্রমণ' বলে। Palacios আল-আরাবির সূত্র ধরে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে পূর্বোক্ত বইটি লেখেন। সাম্প্রতিক কালে দুই ইতালীয় গবেষক Villard এবং Keruli-র সিদ্ধান্ত, মিরাজকাহিনী একাদশ শতকে ইতালীয় এবং ফরাসিতে অনূদিত হয়েছিল। এর Folk Version মুখেমুখে বণিক ও পর্যটকদের মারফত ইউরোপে পৌঁছেছিল। দান্তের রচনায় মিরাজকাহিনীর প্রভাব পড়েছিল।

এটা খুবই স্বাভাবিক। 'আরব্য উপন্যাসের' বহু গল্প ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় আত্মসাৎ করা হয়েছে। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের গল্প আরবিতে 'কালিলাহ্ উয়া দিমনাহ্' (করটক-দমনক কথা) নামে আত্মসাৎ করা হয়েছিল। পরে আরবি ভার্সান ইতালীয়তে অনূদিত হয়েছিল, সে-ও জানা কথা। তবে বিতর্ক উঠতেই পারে, যেমন উঠেছিল আলেকজান্দ্রিয়ায় চতুর্থ শতকে: 'Who plagiarized from whom? Homer from Moses, or Moses from Homer?' কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, দান্তেকে কোনো যুক্তিতেই যুগসন্ধির প্রতীক বলে চিহ্নিত করা চলে না। তাঁর কাব্যপ্রতিভা উত্তম, এইমাত্র বলা চলে। রেনেসাঁসের সঙ্গে তাঁর সুদূরতম সম্পর্কও আবিষ্কার অসম্ভব। পরিশেষে আবার ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক কৌতুক উল্লেখ করছি। সোভিয়েত ইউনিয়নে সদ্য যা ঘটছে, তাকে কী বলা যাবে? এ যেন জার আমলের সেই প্যানস্লাভিজমের কবর থেকে রুশ শোভিনিজমের ক্ষুধার্ত ড্রাকুলার পুনরুত্থান! কোথায় আধুনিকতা? চারদিকে ধর্মের পুরনো দানবরা Medievalism-এর ভাষায় গর্জন করছে। একে কি 'কালো রেনেসাঁস' বলব? কবরে গ্রামশির হাড় নড়ে ওঠারই কথা। তাঁর 'Passive Revolution' তত্ত্বের রূপায়ণ নাকি? 'কইবেন না কত্তা! ঘোড়ায় হাসব।'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

২

মার্কসের প্রাসঙ্গিকতা

'চতুরঙ্গ' অগস্ট সংখ্যায় ড. দেবকুমার বসুর 'ধনতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ে মার্কসীয় অর্থনীতির প্রাসঙ্গিকতা' প্রবন্ধটি পড়ে দু-চারটে কথা বলতে চাই। লেখক স্বয়ং অর্থনীতিবিদ এবং প্রবন্ধে উল্লিখিত কেইনস, কালেসকি, অমিত ভাদুড়ী সকলেই অর্থনীতিবিদ। আমি অর্থনীতিবিদ নই, আমার আগ্রহের বিষয় শিল্প-সাহিত্য এবং সেই আগ্রহ থেকেই অর্থনীতি সম্বন্ধ আমার পর্যবেক্ষণ। ১৯৬০ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম : 'সুধীন্দ্রনাথের সদাজাগ্রত সংবিতে ব্যক্তির ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা তথা প্রপঞ্চ যে-শূন্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিধৃত তাকে হয়তো কেউ-কেউ বর্ণনা করবেন ধনতন্ত্রের সেই পরাব্যক্তিক শক্তির সঙ্গে যার দৌরাত্ম্যে আজকের স্বরাট উৎপাদক সম্প্রদায়ও মুনাফার জন্যে পুঁজি বিনিয়োগ এবং পুঁজিবৃদ্ধির জন্যে মুনাফা অর্জনের নাগরদোলায় চড়ে কেবলই নিরুপায়ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, এই নাগরদোলা থেকে নেমে পড়বার সাধ্য কারো নেই, যদি-বা সাধ থেকেও থাকে।' অতঃপর ১৯৬১ সালে "দ্বিতীয় পৃথিবী" নামক আমার কাব্য-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে লিখি : 'ভাব-প্রবণতায় ভাঁটা পড়া শুরু হতে বুঝতে পারছি যে একদা যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নাভিশ্বাস কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম কিছু অন্তর্দৃষ্টি ও আত্ম-সংশোধনে তার পক্ষে পুনর্যৌবন লাভ করা সম্ভব।'

এবার মার্কস ও মার্কসবাদের প্রসঙ্গে আসি। মার্কসের সময় ধনতন্ত্রের ও ধনতান্ত্রিক শোষণের একরকম চরিত্র ছিল। কিন্তু বিশেষত দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পরে ধনতন্ত্রের ও শোষণের চরিত্র পালটে যায়। ধনতন্ত্র আবিষ্কার করে যে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করাও চাই তা না হলে বিক্রয়-না-হওয়া উৎপন্ন পণ্য স্তূপীকৃত হয়ে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট সৃষ্টি করবে। এবং 'বাণিজ্যচক্রে'র ক্রমান্বয় পুনরাবর্তন ঘটাবে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে বঞ্চনা ও শোষণের রূপ পালটাতে হয়। তার ফলে পুরোনো শোষিত শ্রেণী ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন যে শোষিত শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে তা নানা রূপ আর্থিক সুরক্ষা দিয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। তাই তার বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের প্রকৃতিও ভিন্ন।

কেইনস বাণিজ্যচক্র থেকে উদ্ভূত আর্থিক সংকট মোচনের জন্যে সরকারি উদ্যোগে পুঁজি বিনিয়োগ করে বাজারকে চাঙ্গা রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ধনতন্ত্র বাজার চাঙ্গা রাখার অন্য এক উপায় উদ্ভাবন করেছে : সমরাস্ত্র উৎপাদন—সমরাস্ত্র বিক্রয়—আরও সমরাস্ত্র উৎপাদন। এর ফলে বিশ্বের অর্থনীতি সর্বদা তেজি থাকে, কর্মসংস্থানসমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে, অধিকাংশ মানুষ ভোগ্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহে সন্তুষ্ট থাকে। আধুনিক ধনতন্ত্রে সমরাস্ত্রের বাণিজ্যই প্রধান বাণিজ্য অর্থাৎ মৃত্যু ও ধ্বংসই ধনতন্ত্রের প্রধান বাণিজ্য কিনা এবং এই বাণিজ্যে কোনো 'চক্র'সংকট দেখা যাচ্ছে কিনা—এই বিষয়ে ড. বসুর আলোচনায় কোনো সুস্পষ্ট বিচার নেই।

এর পর আসছে বর্তমান ধনতন্ত্রে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামে উৎসাহিত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রবন্ধটি পড়ে বুঝতে পারলাম না যে বর্তমান ধনতন্ত্রে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা কী। ধনতন্ত্রের থেকে উদ্ভূত শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতালাভ সম্বন্ধে মার্কসবাদের বক্তব্য আজও সত্য প্রমাণিত হয় নি। কোনোদিন হবে কি? পক্ষান্তরে মার্কসবাদের সরকারি তল্পিবাহকরাই বাস্তবে এক নতুন শোষকশ্রেণীতে পরিণত হয়ে মার্কসের মুখে চুনকালি মাখিয়েছে। কিন্তু এই তল্পিবাহকরা কি মার্কস-কে 'অপ্রয়োজনীয়' প্রমাণ করেছে?

মার্কস যখন "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" রচনা

করেন তখন তাঁর বয়স ৩০ এবং তখন পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্র বার্লিন-প্যারিস-ব্রাসেলস তথা মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সীমাবদ্ধতার থেকেই ১৮৪৮ সালে তিনি "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" লেখেন যার মধ্যে এক তীব্র বৈপ্লবিক আবেগ অসাধারণ সাহিত্যিক বা কাব্যিক রূপ পেয়েছে। মার্কস ছিলেন গ্যেটে ও শেক্সপীয়রের অনুরক্ত পাঠক এবং "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" একান্তভাবেই গ্যেটের মেফিস্টো-ফিলিস ও শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের উদ্দীপ্ত ভাষণ-গুলিকে মনে করিয়ে দেয়। তথ্যের চেয়ে তত্ত্ব, সত্যের চেয়ে স্বপ্নই এখানে প্রধান।

মার্কস ইংলনডে আসেন "ম্যানিফেস্টো" লেখার দেড়-দু বছর পরে এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে অধ্যয়ন শুরু করেন ১৮৫০-এর মাঝামাঝি থেকে। ১৮৫০ মার্কসের জীবনে একটা বড়ো বাঁক। একথা সন্দেহ করার কারণ আছে যে "কমিউনিস্ট ম্যানি-ফেস্টো" এবং কমিউনিস্ট লীগের বৈপ্লবিক ভাবাবেগ থেকে মার্কস সরে যেতে শুরু করেছিলেন। ১৮৫২ সালে *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* নামক বিখ্যাত পুস্তিকায় লেখেন যে স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্বর নামে যে ঢেউ উঠেছিল তা পৌঁছে দিয়েছে সৈন্যবাহিনী ও কামানের মুখে। তিনি কি তখন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাঁর নাম করে শেকলভাঙার ডাক দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে নতুন শেকল পরানো হবে, ধনিকশ্রেণীর শোষণ বন্ধ করে নতুন শ্রেণীর শোষণ শুরু হবে? কিন্তু ওই পুস্তিকাতে তিনি নিজেই দেখিয়েছেন যে মানুষের চেষ্টা এক লক্ষ্যের দিকে এগোতে গিয়ে অন্য লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

১৮৫০ থেকে মার্কস যে গবেষণার কাজ শুরু করেন তার পরিণাম অপূর্ব সাহিত্যিক শৈলীতে লেখা *Das Capital* নামে জনসমক্ষে প্রকাশিত হল ১৮৬৭ সালে। পরবর্তী ১৬ বছরেও তিনি নিরলস ভাবে একই কাজ করেছেন যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। তাঁর বিখ্যাত ও সাম্প্রতিকতম জীবনীকার ডেভিড ম্যাক্‌লেলান লিখেছেন যে মার্কসের বৈদগ্ধ্য ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন বিকাশশীল প্রক্রিয়া—'which can neither be split into periods nor treated as a monolith'. আমার মনে হয়, এখানেই মার্কসের প্রাসঙ্গিকতা—মার্কস কোনো অখণ্ড অভ্রান্ত পাষাণপ্রতিম সত্য নয়, তা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথে সত্য সন্ধানের জন্যে এক অনন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ প্ররোচনা।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
৯১এ প্রিন্সেপ্ট এস্টেট কলকাতা-৭০০ ০৯২